# বেনামী-বন্দর

প্রেমেন্দ্র মিত্র

# বেনামী বন্দর

প্রেমেন্দ্র মিত্র

মিত্র ও ঘোষ

১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

বন্ধু নৃপেন্দ্রকৃষ্ণকে দিলাম

—প্রেমেন্দ্র মিত্র
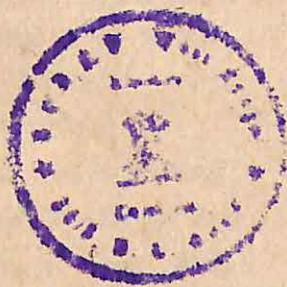
এই লেখকের

ধূলিধূসর
পাঁক
পুতুল ও প্রতিমা
সম্রাট
প্রথমা
উপনায়ন
কুয়াশা
মৃত্তিকা
ফেরারী ফৌজ

## শুধু কেরাণী

তখন পাখীদের নীড় বাঁধবার সময়। চঞ্চল পাখীগুলো খড়ের কুটি, ছেঁড়া পালক, শুকনো ডাল মুখে ক'রে উৎকণ্ঠিত হয়ে ফিরছে।

তাদের বিয়ে হ'ল।—ছুটি নেহাৎ সাদাসিধে ছেলেমেয়ের।

ছেলেটি মার্চেন্ট আফিসের কেরাণী—বছরের পর বছর ধ'রে বড় বড় বাঁধানো খাতায় গোটা গোটা স্পষ্ট অক্ষরে আমদানি-রপ্তানির হিসাব লেখে। মেয়েটি শুধু একটি শ্যামবর্ণ সাধারণ গরীব গৃহস্থঘরের মেয়ে—সলজ্জ সহিষ্ণু মমতাময়ী।

আফ্রিকা জুড়ে' কালো কাফ্রী জাতের উদ্বোধন-হুঙ্কারে সাদা বরফের দেশের আকাশ কেমন ক'রে শিউরে উঠছে সে খবর তারা রাখে না। হলুদবরণ বিপুল মৃতপ্রতিম জাতি একটা কোথায় কবরের চাদর ছুঁড়ে ফেলে' খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে তাজা রক্তের প্রমাণ দিতে, সে খোঁজ রাখবার তাদের দরকার হয় না।

তারা বাংলার নগণ্য একটি কেরাণী আর কেরাণীর কিশোরী বধূ।

আসন্নযৌবনা মেয়েটি স্বজনহীন স্বামীর ঘরে এসে গৃহিণী হ'ল।

প্রেমের কবিতা তারা লেখে না, পড়বার ফুরসৎ বা সুবিধাও বড় নেই। দুজনে দুজনকে সম্বোধন করতে নবনব কল্পনা-লোকের সম্ভাষণ চয়ন করে না। শুধু এ ওকে বলে—'ওগো'।

সকাল বেলা স্বামীকে খাইয়ে-দাইয়ে হাতে পানের ডিবেটি দিয়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে মেয়েটি একটি দরজার আড়াল থেকে ঈষৎ মুখ বার ক'রে সলজ্জ একটু করুণ হাসি হাসে;—ছেলেটিও ফিরে' চেয়ে হাসে। কোনো দিন বা মেয়েটি বলে মৃদুমধুর স্বরে—"ওগো তাড়াতাড়ি এসো, কালকের মতো দেরি কোরো না!" ছেলেটি হয়ত অনুযোগের স্বরে বলে—"বাঃ! কাল ত মোটে আধঘণ্টা দেরি হয়েছিল; বললুম ত রাস্তায় ট্রামের তার খারাপ হয়ে গিয়েছিল ব'লেই···একটু দেরি হ'লেই বুঝি অমনি অস্থির হয়ে উঠতে হয়?" মেয়েটি লজ্জিত হয়ে বলে—"হ্যাঁ আমি বুঝি অস্থির হই!"

সন্ধ্যায় দরজায় একটি টোকা পড়তে না পড়তেই দুটি উৎসুক হাতে দরজাটি খুলে' যায়; সারাদিনের পরিশ্রমশ্রান্ত ছেলেটি ধীরে ধীরে গিয়ে পরিস্কন্ন বিছানায় একটু ব'সে আপত্তি ক'রে বলে—"না গো, তোমায় জুতোর ফিতে খুলে' দিতে হবে না।" মেয়েটি প্রতিবাদ ক'রে বলে—"তা দিলেই বা তাতে দোষ কি?" ছেলেটি

একটু রাগ দেখিয়ে বলে—"ওটা কি আমি নিজে পারিনে ?" মেয়েটি খুলতে খুলতে বলে—"তা হোক্—তুমি চুপ করো দেখি।"

ছুটির দিন তাদের আসে। সেদিন একটু ভালো খাবার-দাবারের আয়োজন হয়, কোনদিন দুটি একটি বন্ধু আসে নিমন্ত্রিত হয়ে। মেয়েটি সলজ্জ-সঙ্কোচে আপাদমস্তক অবগুণ্ঠিত হয়ে পরিবেষণ করে। সে-দিন বিছানায় আলস্যে হেলান দিয়ে গল্প করবার দুপুর। জ্ঞানাভিমানহীন কেরাণী আর কেরাণী-প্রিয়ার সাধারণ আনন্দ-আলাপ। জটিল তর্কের দুরূহ সমস্যার গোলকধাঁধায় তারা ঘুরে' ঘুরে' হায়রান হয় না, সহজেই সে-সব মীমাংসা ক'রে ফেলে। মেয়েটি হয়ত জিজ্ঞাসা করে—"আচ্ছা, মশা মারলে পাপ হয় ত ?" ছেলেটি হয়ত বলে—"নিশ্চয়ই ; আর মেরো না।" মেয়েটি বলে —"বেশ! কিন্তু রোজ যে মাছগুলো মেরে খাও, পাঁঠার মাংস খাও, তার বেলা ?" ছেলেটি একটু বিব্রত হয়ে বলে—"বাঃ! ও যে আমাদের আহার। যা আমাদের আহারের তা খেলে কি পাপ হয় ?—তা হ'লে ভগবান্ আমাদের আহার দেবেন কেন ?" মেয়েটি বলে—"ও—।" মেয়েটি হয়ত বলে—"ওদের বাড়ির বৌরা কাল বেড়াতে এসেছিল, ওরা বলছিল কোন্ গণৎকার নাকি গুনে' বলেছে আর দশ দিন বাদে পৃথিবীটা চুরমার হয়ে যাবে একটা ধূমকেতুর সঙ্গে ধাক্কা লেগে,—সত্যি ?" ছেলেটি হেসে বলে—"মেয়েদের যেমন সব আজগুবি কথা! চুরমার হয়ে গেলেই হ'ল

কিনা!" মেয়েটি গম্ভীর হয়ে বলে—"আমিও বিশ্বাস করিনি! আর একবারও ত অম্‌নি গুজব উঠেছিল, তখন আমাদের বিয়ে হয়নি।" এমনিতর্ তাদের ছুটির আনন্দগুঞ্জন।

একদিন ছেলেটি ট্রামের পয়সা বাঁচিয়ে হেঁটে এল। সেই পয়সায় রাস্তার মোড়ে একটি গোড়ের মালা কিন্‌লে। ঘরে এসে হঠাৎ মেয়েটির খোঁপায় জড়িয়ে দিয়ে বললে—"বল দেখি কেমন গন্ধ?" মেয়েটি বিস্মিত আনন্দে মালাটি দেখতে দেখতে একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বললে—"কেন আবার তুমি বাজে পয়সা খরচ করতে গেলে বল ত?" ছেলেটি বললে—"বাজে পয়সা খরচ বুঝি! ট্রামের পয়সা আজ বাঁচিয়ে তাইতে কিনেছি।" এবার মেয়েটি সত্যি রেগে বললে—"এই ছাই ফুলের মালা কেনবার জন্যে তুমি এই পথটা হেঁটে এলে? যাও, চাইনে আমি তোমার ফুলের মালা!" ছেলেটি ক্ষুব্ধস্বরে বললে—"বাঃ—অমনি রাগ হয়ে গেল, সব কথা আগে শুনলে না কিছু না, অম্‌নি রাগ! আজ আফিসে বড্ড মাথাটা ধরেছিল, ভাবলুম মাঠের ভিতর দিয়ে হাওয়ায় হেঁটে গেলে ছেড়ে যাবে,—তার উপর সকাল সকাল ছুটি হ'ল; একি এতই অন্যায় হয়ে গেছে? বেশ যা হোক্!" মেয়েটি একটু কাতর হয়ে বললে—"আমি রাগ করলুম কোথায়? তুমি মিছি-মিছি ফুলের মালা কেনবার জন্যে হেঁটে এসেছ ভেবে—"। ছেলেটি বললে—"দাও, ফুলের মালাটা ফেলে দাও তাহ'লে!"—এবার

মেয়েটি পরম আনন্দে ফুলের মালাটি খোঁপায় জড়াতে জড়াতে বললে—"হুঁ—ফেলে দিচ্ছি এই যে! বাবা! একটা ভালো কথা যদি তোমায় বলবার জো আছে।"

একদিন একটু বেশি জ্বর হ'ল মেয়েটির। তার পরদিন আরো বাড়ল। তার পরদিনও কম্‌ল না। আফিস যাবার সময় উৎকণ্ঠিত হয়ে ছেলেটি বললে—"এখানে এমন ক'রে কি ক'রে চলবে। দেখবার একটা লোক নেই—এই বেলা তোমার বাপের বাড়ি যাবার বন্দোবস্ত করি।" মেয়েটি বললে—"না না, ও কালকেই সেরে যাবে···তুমি আফিস যাও, ভাবতে হবে না।" ছেলেটি উদ্বিগ্ন হৃদয়ে কাজে গেল উপায় ভাবতে ভাবতে। তার পরদিনও জ্বর বাড়ল দেখে' বললে—"না, আমার আর সাহস হচ্ছে না। আমি সমস্ত দিন আফিসে থাকি, জ্বর বাড়লে কে তোমায় দেখে! তোমায় রেখে আসি চল ওখানে।" মেয়েটি করুণ-চোখে তার দিকে চেয়ে রইল, তারপর মুখ ফিরিয়ে বললে—"আমার সেখানে ভালো লাগে না।"

জ্বরের মধ্যে রাঁধারাঁধি নিয়ে দুজনের রাগারাগি হয়। মেয়েটি বলে—"আমি খুব পারব—তোমার না খেয়ে আফিস যাওয়া হবে না।" ছেলেটি বলে—"তুমি পারলেও আমি রাঁধতে দেব না। আমি না-হয় হোটেলে খাব।" মেয়েটি বলে—"হ্যাঁ, ভদ্রলোকে বুঝি হোটেলে খেতে পারে!" ছেলেটি বলে—"দরকার

হ'লে সব পারে।" মেয়েটি তবু বলে—"তোমার এখনো ত দরকার হয়নি।"

তারপর জোর ক'রে মেয়েটি রাঁধতে যায়। ছেলেটি এবার খুব রাগ করে, ভীষণ এক দিব্যি দিয়ে বলে—"যে আজ রাঁধবে সে আমার মরা মুখ দেখবে।" মেয়েটি দিব্যি শুনে স্তম্ভিত হয়ে বিছানায় শুয়ে কাঁদতে থাকে। ছেলেটি অনুতপ্ত হয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করবার চেষ্টায় বলতে থাকে—"তুমি অবুঝের মত জেদ করলে তাই না আমি দিব্যি দিলুম; লক্ষীটি, রাগ কোরো না। আচ্ছা ভেবে দেখ দেখি আগুন-তাতে রেঁধে যদি তোমার জ্বর বেশি বাড়ে তখন ত আমারই কষ্ট বাড়বে। এখন ত এক দিন রান্না পাচ্ছিনে তখন ত কতদিন পাব না···সে ত আমারই কষ্ট ···তুমি ভালো হয়ে যত খুশি রেঁধো-না, আমি কি বারণ করছি ?" মেয়েটি বলে—"বেশ ত, খুব হয়েছে, দিব্যি দিয়েছ—আমি ত আর রাঁধতে যাচ্ছিনে !"···ছেলেটি আরো অনুতপ্ত হয়ে বোঝাতে থাকে।

সেবারে জ্বর আপনা থেকেই ধীরে ধীরে সেরে' গেল।

তাদের রাগারাগির পালাও এমনি ক'রে সমাপ্ত হ'ল।

নূতন নীড়ে তখন অচেনা অতিথির সমাগম হয়েছে। একটি খোকা।

কিন্তু মেয়েটির আর বাপের বাড়ি থেকে আসা হয়ে উঠছে না। অসুখ আর সারতে চায় না, বাপ-মাও অসুখ-সুদ্ধ মেয়েকে ছেড়ে দিতে রাজি হয় না। ডাক্তার-ধাত্রী বলে—'সূতিকা'।

ছেলেটি বন্ধুদের কাছে উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে বেড়ায়—"হ্যা ভাই, সূতিকা হ'লে কি বাঁচে না ?"

মেয়েটি দিন দিন আরো কাহিল হয়ে যেতে লাগল—বিছানা থেকে আর ওঠবার ক্ষমতা রইল না ক্রমে।

ছেলেটি রোজ আফিসে দেরি হবার জন্যে বকুনি খায়। হিসাবভুলের জন্যে তাড়া খায়।

কিন্তু তারা সৃষ্টির বিরুদ্ধে এই অকারণ উৎপীড়নের জন্যে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে জানে না। নির্দোষের উপর এই অন্যায় অবিচারে, বিধাতার পক্ষপাতিত্বে ক্ষিপ্ত হয়ে অভিশাপ দেয় না সংসারকে। মানুষের কাছে তারা মাথা নিচু ক'রে চলে,—বিধাতার কাছেও।

মেয়েটি কোনো দিন স্বামীকে একলা কাছে পেয়ে, করুণ কাতর চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে বলে—"হ্যাঁ গা, আমি বাঁচব না ?

ছেলেটি জোর ক'রে বুক-ফাটা হাসি হেসে বলে—"কি যে পাগলের মত বল তার ঠিক নেই। বাঁচবে না কেন, কি হয়েছে তোমার ?"

মেয়েটি চোখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বলে—"আমি মরতে চাইনে কিছুতেই।"

ছেলেটি আবার হেসে বলে—"ওসব আজগুবি কথা কোথায় পাও বল ত?"

একটা হাসি আছে—কান্নার চেয়ে নিদারুণ, কান্নার চেয়ে হৃৎপিণ্ড-নেংড়ান।

রোগ কিন্তু ক্রমশ বেড়েই চলল। মেয়েটি আর স্বামীর কাছে জিজ্ঞাসা করে না—"হ্যাঁ গা, আমি বাঁচব না?" বরঞ্চ তার সামনে প্রফুল্ল মুখ দেখিয়ে হাসতে চেষ্টা ক'রে বলে—"তুমি ভাবছ কেন, আমি ত শীগ্‌গিরই সেরে উঠছি।" তারপর ঘরকন্না পাতবার নব-নব কল্পনার গল্প করে, কেমন ক'রে ছেলে মানুষ করবে, তার নাম কি রাখবে, এইসব। ছেলেটিও তার শিয়রে ব'সে করুণ হেসে তার শীর্ণ হাতটি নিজের হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে শোনে। মেয়েটি বলে—"তুমি ভেবে ভেবে মন খারাপ কোরো না, আমি ঠিক সেরে উঠব।" ছেলেটি বলে—"কই, আমি ভাবিনে ত! সেরে উঠবে না ত কি, নিশ্চয়ই উঠবে।" কিন্তু তারা বুঝতে পারে এ ছলনা দুজনের কারুরই বুঝতে বাকি নেই। তবু তারা পরস্পরকে সান্ত্বনা দিতে এই করুণ ছলনার নিষ্ঠুর মর্মান্তিক অভিনয় করে। তারপর লুকিয়ে কাঁদে।

তবু ছেলেটিকে নিত্যনিয়মিত আফিস যেতে হয়। বড় বড় বাঁধানো খাতাগুলোর নির্ভুল গোটা-গোটা অক্ষরগুলো নির্বিকার-ভাবে চেয়ে থাকে। তেম্‌নি হিসাবের পর হিসাব নকল করতে হয়।

তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরবার জন্যে প্রাণ আকুল হয়ে উঠলেও

ছেলেটি হেঁটে আসে—ট্রামের পয়সা বাঁচিয়ে ফুলের মালা কেনবার জন্যে নয়—অসুখের খরচ জোগাতে।

কোনো সময় হয়ত একবারটি মনে হয় যদি সে এমন গরীব না হ'ত, আরো ভালো ক'রে ডাক্তার দেখিয়ে আর-একটু চেষ্টা ক'রে দেখত।

শুধু সেদিন জ্ঞান হারাবার আগে মেয়েটি একটিবারের জন্যে এতদিনকার মিথ্যা করুণ ছলনা ভেঙে দিয়ে কেঁদে ফেলে বললে —"আমি মরতে চাইনি,—ভগবানের কাছে রাতদিন কেঁদে জীবন ভিক্ষা চেয়েছি, কিন্তু—"

সব ফুরিয়ে গেল।

তখন কাল-বোশেখীর উন্মত্ত মসীবরণ আকাশে নীড়ভাঙার মহোৎসব লেগেছে।

'পুন্নাম—'

অসুখ আর কিছুতেই সারে না।

কাসি সর্দি সারে ত খোসে সর্বাঙ্গ ছেয়ে যায়, খোস গিয়ে লিভার ওঠে ঠেলে—তারপর ন্যাবায় ধরে। চার বছরের ছেলেটাকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি চলেছে ত চলেইছে।

প্যাকাটির মত সরু চারটে হাত-পা নড়বড় করে, ফ্যাকাসে হলুদবরণ মুখে কাতর অসহায় চোখ দুটি শুধু জুল্-জুল্ করে—সে চোখে বিশ্বের সকল ক্লান্তি, সকল অবসাদ, সমস্ত বিরক্তি যেন মাখানো।

শিশুর চোখ সে নয়—জীবনের সমস্ত বিরস বিস্বাদ পাত্রে চুমুক দিয়ে তিক্তমুখে কোনো বৃদ্ধ যেন সে চোখকে আশ্রয় করেছে। শুধু ওই অসহায় কাতরতাটুকু শিশুর।

সারাদিন কান্না আর অন্যায় বায়না। ছবিও এক এক সময় আর পারে না। হঠাৎ পিঠে এক থাবড় মেরে সে বলে, "মর্‌না, মরলে যে হাড় জুড়োয় আমার।"

শিশু আরো জোরে নিশীথগগন বিদীর্ণ করবার আয়োজন করে।

পাশের বিছানায় ললিত একবার পাশ ফিরে শোয়, একটু ছট্‌ফট্‌ করে, কিন্তু কিছু বলে না। আগে অনেকবার স্ত্রীকে সে এই নিয়ে ধমকেছে। দুজনের এই নিয়ে ঝগড়াও হয়েছে। কিন্তু আজকাল আর কিছু বলতে পারে না। ছবির এই আকস্মিক অসহিষ্ণুতার পেছনে কি বিপুল বেদনা, হতাশা ও ক্লান্তির ভার যে আছে তা সে বোঝে। কিন্তু তবু বুকটা যেন টন্‌টন্‌ ক'রে ওঠে।

কিন্তু উপায় নেই। ডকের মাল-তোলা ও নাবানোর সামান্য সরকার। জাহাজ ডকে ভিড়লে তবে দুপয়সা আসে। নইলে নিছক ব'সে থাকা ছাড়া উপায় নেই। মাসে যা আয় হয় তাতে মুদির ঋণ শোধাই চলে না, তা ডাক্তার। কিন্তু তবু সে কোনো ত্রুটি রাখেনি।

শিশু আকাশ ফাটিয়ে চীৎকার করে—সে চীৎকার আর থামতে চায় না। সে চীৎকারে বেদনা নেই—আছে শুধু যেন সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

ছবি রাগের মাথায় চাপড় মেরে ফেলে সন্তপ্ত হয়ে নানা রকম করে ভোলাতে চেষ্টা করে। ভীতভাবে স্বামীর বিছানার দিকে চেয়ে বোঝবার চেষ্টা করে স্বামীর অসময়ে নিদ্রার ব্যাঘাত হ'ল কি না। নিজের দুচোখ সারাদিন পরিশ্রমে ক্লান্তিতে ঘুমে জড়িয়ে আসে। কিন্তু শিশু কিছুতেই থামে না। আদর নয়, খেলনা নয়, কিছু সে চায় না। শুধু তার অন্তরের অসীম বিদ্বেষ কান্নার

আকারে উথলে উথলে ওঠে। কান্না নয়—সে সৃষ্টির প্রতি অভিশাপ।

ললিত ঘুমের ভান ক'রে পড়ে থাকে আর ভাবে হয়ত।

জীবনের অন্ধ নিষ্ঠুরতার কথা ভাবে না, নিজের বিপুল ব্যর্থতার কথা ভাবে না—দার্শনিক তত্ত্ব মীমাংসা করবার চেষ্টা করে না—ভাবে শুধু ডাক্তার বলেছে, ও ছেলেকে চেঞ্জে নিয়ে না গেলে চলবে না—কিন্তু সে কেমন ক'রে সম্ভব।

শুনতে পায় ছবি কি কাতর ভাবে কতরকম আদর ক'রে শিশুকে ভোলাবার চেষ্টা করছে।

"লখ্‌খি বাবা আমার, কাঁদে না; কাল তোমাকে একটা লাল মটর গাড়ি কিনে দেব, তুমি ব'সে ব'সে চালাবে—"

শিশুর সেই একঘেয়ে অশ্রান্ত চীৎকার—"কেন তুমি আমায় মারলে—"

ছবি আবার আদর ক'রে কোলে নেবার চেষ্টা করে। "শোন না; তুমি মটরগাড়িতে বসে ভোঁ ভোঁ করে হর্ন বাজাবে—"

শিশু হাত-পা ছুঁড়ে মাকে ঠেলে দিয়ে—সেই একঘেয়ে স্বর ধ'রে থাকে—"কেন তুমি আমায় মারলে—?"

হঠাৎ ললিতের মনে হয় সমস্ত ব্যাপারটা যেন অত্যন্ত হাস্যকর—পরিণত মনের এই শিশু সেজে তাকে ভোলাবার চেষ্টা, শিশুর এই মূঢ় স্বার্থপরতা, এর চেয়ে বিসদৃশ যেন আর কিছু হতে পারে না।

পরক্ষণেই সে নিজের এই মনে হওয়ার জন্যে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে ওঠে। লণ্ঠনের আলোয় ছবির সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত শুষ্ক মুখ, নিদ্রাবঞ্চিত কাতর দুটি চোখ দেখতে পায়। মনের এই অসঙ্গত আচরণে নিজের ওপরই তার রাগ হয়।

তাদের দিকে পিছন ফিরে লক্ষ্যহীন ভাবে সে সামনের দেয়ালের দিকে চেয়ে আবার ভাবতে সুরু করে,—বিশৃঙ্খল অসম্বদ্ধ ভাবনা।

না, বিয়ে ক'রে সে অন্যায় কিছু করেনি। করেছে কি? না, কখখনো না। ভগ্নীপতির বাড়িতে আশ্রিত হয়ে থেকে সামান্য পড়াশুনো শেষ ক'রেই তাকে কাজে ঢুকতে হয়েছে, ভগ্নীপতির আশ্রয়দানের ঋণশোধ করতে। বিয়ে ত সে করবে না-ই ঠিক করেছিল। আর সেজন্যে কারুর কোনো চাড় ছিল ব'লেও বোধ হয় না। বাংলা দেশের পুরুষ সাধারণত যে বয়সে বিয়ে করে তা পেরিয়ে যাবার পরও তার সঙ্কল্প অটুট ছিল কিন্তু টলেনি এমন কথা বলা যায় না। মনে মনে যেন একটা বিপুল অতৃপ্তি দিনরাত তাকে পীড়া দিয়েছে। বিয়ে,—পরিপূর্ণ জীবন, নারীর সাহচর্য, একটি একান্ত নিজস্ব সংসার রচনার আনন্দ, অস্পষ্টভাবে এই সমস্তর জন্য ক্ষুধা তার অন্তরকে ব্যথিত করেছে। চির-কৌমার্যের গৌরবে মন তার কোনদিন উল্লসিত হয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেনি, কেবলি অস্পষ্টভাবে মনে হয়েছে এই একক জীবন ব্যর্থ, পঙ্গু। দারিদ্র্যের কথা সে ভাবেনি এমন নয়, কিন্তু মন

তার বারবার বিদ্রোহ ক'রে বলেছে মানুষের দেওয়া দারিদ্র্যের জন্যে জীবনকে নিষ্ফল ক'রে রাখবার কোনো অধিকার তার নেই।

চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে শুনতে পায় শিশু সেই এক গোঁ ধ'রে চীৎকার করছে "কেন তুমি আমায় মারলে!"

কিন্তু কোথায় চেঞ্জে নিয়ে যাওয়া যায়? ললিত সম্ভব-অসম্ভব অনেক জায়গার কথা ভাবে। টাকারও দরকার। ছবির গয়নার আর কিছু নেই, শুধু দুগাছি বালা—হাতে থাকলে ক্ষয়ে যাবার ভয়ে তোলা আছে। তার দাম কতই বা হবে! বড়জোর এক শ' টাকা। তাই নিয়ে কোথায়ই বা চেঞ্জে যাওয়া যায় এবং কদিনই বা থাকা যায়। এসব ব্যাপার সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

কিন্তু শিশুর চীৎকার যে কিছুতেই থামতে চায় না। ললিত হঠাৎ উঠে বসে। ছবি একেবারে অবসন্ন হয়ে প'ড়ে ওই চীৎকারের মাঝেই ব'সে ব'সে একটু ঢুলছিল। ললিতের ওঠার শব্দে সে চম্‌কে সজাগ হয়ে ওঠে; তারপর কান্নার ওপরেই ছেলেটার পিঠে সজোরে চাপড় মেরে বলে, "হ'ল ত! সকলের ঘুম ভাঙালে ত! —কোথা থেকে এমন রাক্ষস এসেছিল আমার পেটে!"

ললিত এবার ব্যথিত হয়ে বলে, "আঃ, আবার মারো কেন?"

"না মারবে না! রাত-দুপুরে ডাকাত-পড়া চীৎকার ক'রে পাড়া-সুদ্ধ লোকের ঘুম ভাঙালে গা!"

"অসুখে ভুগে ভুগেই না অমন খিট্‌খিটে হয়েছে" ব'লে ললিত

শিশুকে কোলে নেবার চেষ্টা করে। শিশু কিছুতেই কোলে আসতে চায় না। সজোরে ছবির আঁচল মুঠিতে চেপে ধ'রে আরো জোরে চীৎকার স্বরু করে।

ঝট্‌কা দিয়ে আঁচল ছাড়িয়ে নিয়ে ছবি উঠে দাঁড়ায়, বলে, "তা মরুক না! মরলে যে বাঁচি।"

"ছিঃ, কি বলছ ছবি!"

এবার ছবি কেঁদে ফেলে, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, "বলব আবার কি! ও যে বাঁচতে আসেনি সে কি আর আমি বুঝতে পারিনি। এমনি করে ভুগে, ভুগিয়ে, হাড়মাস খাখ্‌ ক'রে ও যাবে।"

ছবি ললিতের দিকে পিছন ফিরে বোধ হয় আঁচলে চোখ মোছে।

শিশু শীর্ণ রক্তহীন হাত বাড়িয়ে ললিতের কোল থেকে 'মার কাছে যাব' ব'লে অশ্রান্তভাবে চীৎকার করে।

"ডাক্তার ত বলেছে চেঞ্জে নিয়ে গেলেই সারবে," ললিতের মুখ থেকে কথাগুলো ঠিক আশ্বাসের স্বরে যেন বেরুতে চায় না। ও আশায় সে নিজেই যে বিশ্বাস হারিয়েছে।

ছবি উত্তর দেয় না। ছেলেটাকে স্বামীর কোল থেকে নিয়ে বিছানায় জোর করে শুইয়ে ধমক দিয়ে বলে, "চুপ কর শীগ্‌গির, ফের চীৎকার করলে দরজা খুলে ওই রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসব।" তারপর নিজে তার পাশে শুয়ে প'ড়ে স্বামীকে বলে, "তুমি শোওনা গিয়ে। এমন ক'রে সারারাত জাগলে চল্‌বে? সারাদিন আফিসে

খাটবে আর সারারাত ছেলের জ্বালায় দুচোখের পাতা এক করতে পারবে না, এমন করলে শরীর টেঁকে !"

ললিত এসে বিছানায় শুয়ে প'ড়ে বলে, "তুমি ত একটুও ঘুমোতে পেলে না।"

"আমি ত এই শুয়েছি, এইবার ঘুমোব।"

কিন্তু ঘুমোন তার হয় না। শিশু এবার নতুন বায়না ধরে। একটা বিশেষ নির্দিষ্ট স্থান দেখিয়ে মাকে বলে, "তুমি শুলে কেন ? এইখানে বোসো না !"

নির্দিষ্ট সেই স্থানটিতে ছবিকে বসতেই হবে। ছবি আদর করে, ধমক দেয়, মিনতি ক'রে বলে, "লক্ষ্মী বাবা, বড্ড ঘুম পেয়েছে, একটুখানি শুই,—আচ্ছা এইখানটাতে শুচ্ছি—এবার ত হ'ল !" কিন্তু তাতে হয় না। সেই থানটাতে শুলে হবে না, বসতে হবে।

শিশুর সেই এক পণ, "শুলে কেন, এইখানটাতে বোসো না।"

শুয়ে শুয়ে ললিতের অসহ্য বোধ হয়। আবার উঠে ব'সে বলে, "ওকে নিয়ে একটু রাস্তায় বেড়িয়ে আসব ?"

ছবি বিরক্ত হয়ে ওঠে, "তুমি আবার উঠলে কেন বল ত ?"

"ওর বায়না যে কিছুতেই থামছে না !"

"তাই জন্যে রাত-দুপুরে রাস্তায় বেড়াতে যেতে হবে ! তুমি শোও দেখি।"

ললিত হতাশ হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। নিদ্রালস চোখ দুহাতে রগড়ে' নির্দিষ্ট জায়গায় ব'সে ছবি শিশুর বায়না নিবৃত্ত করে।

ললিত স্ত্রীর সে শ্রান্ত অবসন্ন মূর্তির দিকে চাইতে পারে না। পেছন ফিরে শুয়ে মনে মনে চেঞ্জে যাবার টাকা সংগ্রহের অসংখ্য আজগুবি কল্পনা করে।

তারপর কখন্ বোধ হয় একটু তন্দ্রা আসে। কিন্তু খানিক বাদেই শিশুর চীৎকারে তন্দ্রা ভেঙে যায়। উঠে দেখে, ব'সে থাকতে থাকতেই কখন্ আর না পেরে অত্যন্ত আড়ষ্টভাবে ছবির মাথাটা কাৎ হয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়েছে। এবং শিশু পা দিয়ে ঠেলে, হাত ধ'রে টেনে, নানা প্রকারে তাকে জাগাবার চেষ্টা ক'রে চীৎকার ক'রে কাঁদছে,—"তুমি শুলে কেন! এই খানে রোসো না!"

অমনি চ'লে এসেছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত!

টিনের চালের একটি বড় ঘর, গোলপাতায় ছাওয়া ছোট্ট একটি নিচু রান্নাঘর আর একফালি সরু উঠোন—এই নিয়ে সংসার। কলতলার পাশে একটা নামহীন বুনো গাছ বেড়ে উঠেছে; অসময়ে শীতকালে তাতে অপরিচিত অজস্র ফুল ধরে; তার না আছে গন্ধ, না আছে রূপ। তবু সেইটুকু শোভা।

ও যেন দীন সংসারের মুখে হতাশার হাসি।

এই ছোট সংসারটির ভেতরেই কিন্তু মানুষের সেই পুরাতন কাহিনীর একটি ক্ষীণ ধারা শ্রান্তভাবে বয় দিন থেকে রাতে, রাত

হতে আবার নতুন দিনে।—মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অমানুষিক কৃচ্ছ্রসাধনার অসামান্য আত্মবলিদানের কাহিনীর ধারা।

হয়ত বিধাতারও চমক লাগে।

ললিত কিন্তু নিজেকে অন্য রকম বোঝায়। তার কাছে অপরিস্ফুটভাবে এ-সব শুধু আনন্দের ঋণ-শোধ, মনুষ্যত্বের গৌরবের মূল্যদান। তার বেশি কিছু নয়। জীবন শুধু মন্থর স্রোতে হালকা নৌকোর মত অত্যন্ত সহজে ভেসে যাবে ভেবে ত সে বিয়ে করেনি। জীবনের অগ্নিপরীক্ষা, বিবাহের দায়িত্ব—অনেক কথাই সে যে আগে ভেবেছে।

তবু ঋণ যেন আর শোধ হতে চায় না। ছবির দিকে সে ভালো ক'রে আজকাল চাইতে পারে না। গলার কণ্ঠি দেখা যায়, চোয়ালের হাড় ঠেলে উঠেছে। পরিশ্রমে দুর্ভাবনায় উনিশ বছরের মেয়ের মুখে যেন উনপঞ্চাশ বছরের ক্লান্তি! খোকা ত দিনের পর দিন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে।

ডাক্তার সেদিন হঠাৎ একবার নিজে থেকে এসেছিল। গাড়ি থামিয়ে দরজার কাছে পা ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়ে ওয়েস্টকোটের দু'পকেটে দু'হাতের বুড়ো আঙুল গুঁজে একটু সামনে ঝুঁকে, পরম আত্মীয়ের মত স্নিগ্ধ অনুযোগের কণ্ঠে ব'লে গেল, "আপনারা এখনো চেঞ্জে নিয়ে যাননি! নাঃ, আপনারা ছেলেটাকে বাঁচতে দিলেন না দেখছি!"

ডাক্তার যেতে ললিত বললে, "কিন্তু ডাক্তার আমাদের একটু ভালোবাসে, দেখেছ ছবি ? ঠিক ব্যবসাদারি আমাদের সঙ্গে করে না। না ?"

ডাক্তারের সহৃদয়তার আলোচনায় খানিকটা সময় বেশ কাটল। ললিত মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে, দু'এক দিনের মধ্যে যা-হোক-ক'রে টাকার জোগাড় সে করবেই। ছবি অন্য দিনের চেয়ে যেন একটু স্ফূর্তিভরে "কলের জল বুঝি যাবার সময় হ'ল" ব'লে কাজে গেল। সমস্ত সংসারের ওপর যে বেদনার গুরুভার চেপে ছিল, সেটা যেন অনেকটা হালকা হয়ে গেল সামান্য একটি মানুষের ক্ষণিকের অভিনয়ে।

কিন্তু সে কতক্ষণ আর!

আবার রাত্রি আসে। ললিত শ্রান্ত হতাশ হয়ে ঘরে ফেরে। শিশু নিয়মিত বায়না ধরে। মার আঁচল চেপে শুয়ে থাকে, মাকে সে ছেড়ে দেবে না।

"রান্না-বান্না কিছু করতে হবে না আমার ? এমনি বসে থাকলে চলবে ?"—

—ছবি জোর ক'রে চ'লে যাবার চেষ্টা করে।

শিশুর কান্নায় কাতর হয়ে ললিত বলে, "থাক্ না, আমি না-হয় যা হোক বাজার থেকে কিছু কিনে আনছি। তুমি বোসো ওর কাছে।"

"হ্যাঁ, এই জল-কাদায় আপিস থেকে দু'কোশ পথ হেঁটে এলে,

আবার এখনি যাবে বাজারে! ছেলের অত আদরে কাজ নেই! আর বাজারের খাবার তোমার সয় কোনদিন?"

"একদিন খেলে কিছু হবে না। আর তুমিও একদিন জিরোও না।" ললিত যেন অনুনয় করে।

"না না, আমি রাঁধতে যাচ্ছি। এই বৃষ্টিতে বাজারে যেতে হবে না।" ছবি জোর ক'রে উঠে পড়ে। শিশু কেঁদে হাত-পা ছুঁড়ে একাকার ক'রে তোলে।

ললিত আর কথা না কয়ে বেরিয়ে যায়। বাইরে টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়ে, পথ কাদায় কাদা। পায়ে পায়ে জুতো সে কাদায় বসে যায়; ললিতের শ্রান্ত পা যেন কাদা থেকে উঠতে চায় না।

।

ওই রুগ্ণ পাঁচ বছরের শিশুকে কেন্দ্র ক'রে এই ছোট সংসারটি ক্লান্তপদে পরমদুঃখের ভার বহন ক'রে নিঃশব্দে আবর্তন করে।

শিশুর অন্ধ অবোধ স্বার্থপরতার কাছে অহরহ বলিদান চলে।

ললিত ভাবে,—শিশু, ভবিষ্যৎ মানব সে, সে যে সব কিছু দাবী করতে পারে, কোনো ত্যাগই তার জন্যে যে যথেষ্ট নয়।

ডাক্তার আর একদিন এসে বক্তৃতা দিয়ে গেছে—এবার আর সহৃদয়তার সুরে নয়, মুরুব্বিয়ানার চালে; চেয়ারে আলগোছে ব'সে কোলের ওপর টুপি খুলে ডান হাতে ছড়ি দোলাতে দোলাতে,

কোমরে বাঁ-হাত দিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে অনেক কথা বলে গেছে,—শিশুকে সংসারে আনবার দায়িত্বের কথা, ভবিষ্যতের প্রতি কর্তব্যের কথা, ইত্যাদি।

যাবার সময় মটরে উঠেও মুখ বার বার ক'রে বলেছে—"দেখুন, এমন ক'রে একটা মানুষকে পৃথিবীতে নিজের সুখের জন্যে এনে যারা তার প্রতি কর্তব্য করে না, তাদের জেল হওয়া উচিত—ঠিক বলুন, জেল হওয়া উচিত নয় ?"

ললিত তেমনি আপিসে যায়-আসে, কিন্তু তার মুখ যেন কঠিন হয়ে গেছে পাথরের মুখের মত। তার মনের গোপনে কি সঙ্কল্প জন্ম নিয়েছে কে জানে!

খোকা সেরে উঠছে। স্পষ্ট সেরে উঠছে। খোলা বারান্দায় ডেক-চেয়ারে ব'সে ব'সে ললিত খোকার খেলা দেখে। ছবি চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে বলে, "কিন্তু কি সুন্দর জায়গা বাপু, আমার যেন আর কলকাতায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না।" তারপর মুখ নামিয়ে ললিতের কানের কাছে চুপি চুপি আনন্দোজ্জল মুখে বলে, "দেখ, কাল খোকাকে কোলে নিতে গিয়ে আমার হাত দুটো টন্ টন্ ক'রে উঠল।"

রাঙামাটির দেশের রঙ যেন ছবিরও গালে লেগেছে ; শালবনের সজীবতা যেন তার সারা দেহে ঝল্মল্ করে।

ললিত তার দিকে একবার মুখ ফিরিয়ে চায়, তারপর নীরবে কি যেন ভাবে।

ছবি খানিক বাদে হেঁকে বলে, "ছি খোকা, ছেড়ে দাও, ওর লাগবে।"

খোকা তখন খেলার সাথিটির ঘাড়ের ওপর চেপে তার মাথাটি মাটিতে ঠোকবার চেষ্টা করছে।

অগত্যা ললিত উঠে গিয়ে ছাড়িয়ে দেয়।

উৎপীড়িত ছেলেটি কিন্তু ধূলোমাখা মাথায় উঠে একটুও না কেঁদে ঈষৎ ম্লান হেসে মধুর কণ্ঠে বলে, "দেখুন ত কাকাবাবু, আমি কি ওকে ঘাড়ে করতে পারি!"

নিজের অজ্ঞাতে প্রতিবেশীর এই সুশ্রী সুন্দর মধুরকণ্ঠ ছেলেটির সঙ্গে নিজের ছেলের তুলনা ক'রে হঠাৎ ললিত মনে মনে অকারণে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করে।

ছেলেটি রোগা, মাথায় রেশমের মত কোমল একমাথা দীর্ঘ চুল,—নীল চোখ দুটিতে, ছোট্ট মুখে ম্লান হাসিটি যেন লেগেই আছে।

ললিত খোকার কান ধ'রে ধমকে জিজ্ঞাসা করে, "কেন ওর মাথা মাটিতে ঠুকে দিচ্ছিলে? ঝগড়া না ক'রে থাকতে পারো না?"

খোকা মুখচোখ রাঙা ক'রে নীরব হয়ে থাকে। অপর ছেলেটি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলে, "না, ঝগড়া হয়নি ত! ও ঘোড়া-ঘোড়া খেলতে বললে কিনা, তাই আমি ওকে তুলতে পারিনি ব'লে

আমার মাথাটা একবার মাটিতে ঠুকে দিয়েছিল। আমার ত লাগেনি!"

"না, ওর গায়ে কখ্‌খনো হাত তুলো না" ব'লে খোকাকে ধম্‌কে ললিত আবার ফিরে এসে বারান্দায় বসে।

ছবি একবার বলে, "খোকার সঙ্গে ওদের টুনু কিন্তু পারে না।" তারপর ললিতের গম্ভীর মুখ দেখে চুপ ক'রে যায়।

খোকা ও টুনুর খেলা কিন্তু জমে না। টুনুর সমস্ত সাধ্যসাধনা, মিনতি-অনুরোধ অগ্রাহ্য ক'রে খোকা ক্রুদ্ধ মুখে গুম হয়ে ব'সে থাকে। তারপর হঠাৎ অকারণে প্রাণপণ শক্তিতে টুনুকে চিম্‌টি কেটে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

টুনু ককিয়ে কেঁদে ওঠে।

ছবি গিয়ে তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে নিয়ে খোকাকে বকতে সুরু করে।

শুধু ললিত চেয়ার থেকে ওঠে না, সমস্ত মুখ তার অকস্মাৎ বেদনায় কালো হয়ে যায়। টুনু শান্ত হয়ে খানিক বাদে যখন এসে বলে, "কাকাবাবু, খোকা আমায় মেরেছে, আর আমি খেলতে আসব না," তখন পর্যন্ত ললিত কথা কয় না, সামনের দিকে চেয়ে নীরবে কি ভাবে সে-ই জানে!

টুনু কিন্তু বিকালবেলা আবার এল।

খোকাকে নিয়ে তখন ললিত একটু লেখাপড়ার চেষ্টা করছে, এবং আধঘণ্টা পরিশ্রমেও স্লেটের ওপর খোকাকে দিয়ে অ-কারের

যৎসামান্য সাদৃশ্যেরও কোনো অক্ষর লেখাতে না পেরে হতাশ হয়ে উঠেছে।

টুনু এসে একপাশটিতে চুপ ক'রে বসল। ললিত বললে, "তুমি অ লিখতে পারো টুনু?"

একগাল হেসে টুনু বললে, "পারি কাকাবাবু, আমি বোধোদয় থেকে টানাও লিখতে পারি! লিখব কাকাবাবু?"

অবাক্ হয়ে ললিত বললে, "তুমি বোধোদয় পড়!"

"বোধোদয় আমার শেষ হয়ে গেছে। অ লিখে দেখাব কাকাবাবু?" ব'লে আগ্রহভরে টুনু স্লেটের দিকে হাত বাড়াল।

খোকা কিন্তু স্লেট দিলে না। দৃঢ়মুঠিতে স্লেট আঁকড়ে ধ'রে রইল।

"ওকে স্লেট্‌টা দিতে বলুন না কাকাবাবু"—টুনু অনুনয় ক'রে বললে, "আমি খুব ভালো ক'রে অ লিখে দেখাব।"

হঠাৎ কঠিন স্বরে ললিত বললে, "থাক্, তোমার লিখতে হবে না, ও এখন পড়ছে, এখন তুমি বাড়ি যাও।"

টুনু অপ্রত্যাশিত কঠিন স্বরে ভীত হয়ে মুখটি কাঁচুমাচু ক'রে আস্তে আস্তে চ'লে গেল।

ললিত কিন্তু আর এক মুহূর্তও ব'সে থাকতে পারলে না; টুনু যেতে না যেতে সে গম্ভীর মুখে উঠে বেরিয়ে গেল।

দেখা হতে ছবি জিজ্ঞাসা করলে, "আজ এরি মধ্যে পড়াশোনা হয়ে গেল? বাবা! ওকে নিয়ে তুমি যে রকম উঠে-প'ড়ে লেগেছ, জজ-মেজিষ্টের না ক'রে আর ছাড়বে না!"

গম্ভীর মুখে ললিত শুধু বললে, "হুঁ।"

ছদিন টুনু আর আসে না। ললিতের লজ্জা গ্লানি ও অনুশোচনার আর অন্ত নেই। খোকাকে নিয়ে একবার তাদের বাড়ি যাবার জন্যে বেরিয়েও সে মাঝপথ থেকে ফিরে এল। নিজের মাথা তার চিরকালের জন্যে হেঁট হয়ে গেছে।

পরদিন হঠাৎ সকালে বাইরের গেটের কাছে বেরিয়েই সে চম্‌কে ডাক্‌লে, "টুনু!"

গেটের পাশে দাঁড়িয়ে টুনু উৎসুকদৃষ্টিতে ভেতরের দিকে চাইছিল। ললিতকে দেখতে পেয়ে সে ভীত কুণ্ঠিতভাবে চ'লে যাবার উপক্রম করলে।

"তুমি আর খোকার সঙ্গে খেলতে আস না কেন টুনু?"

সাদর সম্ভাষণে ভরসা পেয়ে টুনু অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বললে, "আপনি তাহ'লে বকবেন না ত কাকাবাবু?"

অকারণেই ললিতের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। এই ক্ষীণকায়, ফুলের মত কমনীয় ছেলেটির সমস্ত কথাবার্তা আচরণে এমন একটি সকরুণ ভাব আছে!

তাড়াতাড়ি তাকে বুকে তুলে নিয়ে ললাটে চুমু খেয়ে ললিত বললে, "না বাবা, আমি কেন তোমায় বকব!"

টুনুর মুখ তৎক্ষণাৎ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল—বললে, "আমি খেলতে যাই তাহ'লে?"

তাকে নামিয়ে দিয়ে ললিত বললে, "যাও।"

টুনু উল্লসিত হয়ে ছুটে গেল।

দুদিন বাদে আজ প্রথম প্রসন্ন মনে ললিত বেড়াতে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু ফিরে এসে সে প্রসন্নতা তার রইল না।

দরজার কাছ থেকেই খোকার উচ্চ ক্রুদ্ধ কণ্ঠ শুনতে পাওয়া গেল।

"না, ওকে দুটো দিতে পারবে না মা! কেন, ও নিজের বাড়িতে গিয়ে খেতে পারে না? হ্যাংলা কোথাকার!"

লজ্জায়, বেদনায়, রাগে ললিতের কান পর্যন্ত রাঙা হয়ে উঠল। হিংসার এ জঘন্য রূপ ওইটুকু শিশুর মাঝে প্রকাশ পেল কোথা থেকে, ভাবতে ভাবতে সে নিঃশব্দে আপনার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

সেখান থেকে শুনতে পেল ছবি বোঝাবার চেষ্টা করছে—"না বাবা, ওরকম হিংসুটে-পনা কি করতে আছে, ও তোমার ভাই হয়; ও দুটো খাক্ তুমিও দুটো খাও।"

টুনুর মিষ্ট গলা শোনা গেল—"আমি ত দুটো সন্দেশ খাব না কাকিমা; আমার অসুখ করেছে কিনা, আমি একটুখানি খাব শুধু।"

"আচ্ছা বাবা, তুমি একটা নাও,—আর খোকন্, এই তোমার দুটো, কেমন হ'ল ত?"

কিন্তু এও খোকার মনঃপূত নয়।

"না, ওকে একটাও দিতে পারবে না, ওকে দাওনা দেখি, আমি ওর হাত থেকে কেড়ে নেব।"

ছবি এবার রেগে বললে, "কেড়ে নে না দেখি! তুই ত দুটো পেয়েছিস। ও একটা খেলে তোর অত হিংসে কেন?"

"কেন ও আমাদের বাড়ি খাবে! বাবা ত তাড়িয়ে দিয়েছিল, ও আবার এসেছে কেন?"

"বেশ করবে আসবে, বেশ করবে খাবে।"

ব্যাপারটা হয়ত সামান্য। কিন্তু ঘরে ব'সে ব'সে শুনতে শুনতে ললিতের অসহ্য বোধ হচ্ছিল। তার জীবনের সমস্ত আশা, সমস্ত স্বপ্ন, সমস্ত সান্ত্বনা কে যেন মাড়িয়ে থেঁৎলে চ'লে গেছে।

সে নীরবে উঠে গিয়ে পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়াল।

ছবি তখন টুনুর হাতে একটি সন্দেশ দিয়েছে। টুনু বলছিল, "আমি ত সবটা খাব না কাকিমা—আমার বড্ড অসুখ করেছে কিনা! আমার ত খেতে নেই।"

কিন্তু তার কথা শেষ হতে না হতেই খোকা সজোরে হাত মুচড়ে' সন্দেশটা কেড়ে নিয়ে বললে, "ঈস্, সন্দেশ ওকে খেতে দিচ্ছি কিনা!"

হাতের ব্যথায় টুনু কাতর হয়ে কেঁদে উঠল।

ছবি রেগে খোকার পিঠে চড় কসিয়ে দিলে।

ললিত যেমন নীরবে এসেছিল তেমনি নীরবে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

... ... ... ...

ছবি এসে বললে, "আহা, ওদের টুনুর বড্ড অসুখ গো!"

ললিত সন্ধ্যার অন্ধকারে বারান্দায় ব'সে ছিল, ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "কার, টুনুর ?"

"হ্যাগো, ওর মা তাই কাঁদছিল, ছেলেটা এমন ভালো জায়গায় এসেও সারল না। দিন দিন যেন কেমন শুকিয়ে গেল।"

ললিত আবার মুখ ফিরিয়ে নীরবে দূরে অন্ধকার গিরিশ্রেণীর দিকেই বোধ হয় চেয়ে রইল।

ছবি ঘরে যাবার উদ্যোগ করতে কিন্তু ললিত হঠাৎ আঁচল ধ'রে টেনে বললে, "শোন !"

"কি ?" ব'লে ছবি কাছে এসে দাঁড়াল।

আবার খানিকক্ষণ চুপ-চাপ।

"কি বলবে তাড়াতাড়ি বল বাপু, আমার কাজ আছে !"

চেয়ারটা ছবির দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে ব'সে ললিত বললে, "খোকা ত বেশ সেরে গেছে, না ছবি ?"

"তাই ত মনে হচ্ছে।"

"তাহ'লে তুমি খুব খুশি হয়েছ ত ?"

"কি যে কথা বল তার মাথা মুণ্ডু নেই, একি আবার জিজ্ঞেস করে নাকি মানুষ ! আমি খুশি হয়েছি আর তুমি খুশি হওনি ?"

ললিত শুধু বললে, "হুঁ"।

ছবি আবার চ'লে যাচ্ছিল। ফের তার আঁচল ধ'রে টেনে রেখে ললিত বললে, "এই খোকা হয়ত বড় হবে, মানুষ হবে, সংসার করবে—কি বল ছবি ?"

গলার স্বরটা ছবির কাছে যেন অস্বাভাবিক মনে হ'ল, বললে, "কি তুমি যা-তা বলছ বল ত ?"

"শোন না, এই খোকা ভবিষ্যতের আশা; পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ও পৃথিবীকে ভোগ করবে, ধন্য করবে, তাই জন্যে আমাদের এই এত আয়োজন, এত ত্যাগ, বুঝেছ ?"

"যাও, ন্যাকামি আমার ভালো লাগে না" ব'লে জোর ক'রে আঁচল ছাড়িয়ে ছবি চ'লে গেল।

ললিত অন্ধকারে ব'সে বোধ হয় সেই ভবিষ্যতেরই একটু আভাস কল্পনায় দেখবার চেষ্টা করতে লাগল।

ক'দিন বাদে হঠাৎ অর্ধরাতে কান্নার স্বরে ঘুম ভেঙে উঠে ছবি ললিতকে জাগিয়ে বললে, "শুনতে পাচ্ছো ?"

ললিত বললে, "হুঁ।"

ছবি ভীত পাংশুমুখে বললে, "কান্নাটা টুনুদের বাড়ি থেকেই আসছে না ?"

"তাই ত মনে হচ্ছে।"

"কাল বড্ড বাড়াবাড়ি গেছে, বোধ হয় মারা গেল।" ব'লে ছবি চোখ মুছলে।

ললিত বিছানা থেকে নেমে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ঘরের মধ্যে পায়চারি ক'রে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ থম্‌কে

দাঁড়িয়ে বিকৃত স্বরে বললে, "টুনু ম'রে গেল আর আমাদের ছেলে বেঁচে উঠল—আশ্চর্য নয় ছবি ?"

ছবি একবার শিউরে উঠল মাত্র, উত্তর দিল না। ললিত মাথা নিচু ক'রে পায়চারি ক'রে বেড়াতে বেড়াতে ব'লে যেতে লাগল, "আমরা অনেক ত্যাগ করেছি, অনেক সয়েছি, আমাদের ছেলে বাঁচবেই যে ছবি! আমাদের ছেলের মত আরো কোটি কোটি ছেলে বাঁচবে, বড় হবে, রেষারেষি, মারামারি, কাটাকাটি ক'রে পৃথিবীকে সরগরম ক'রে রাখবে; নইলে আমাদের এত চেষ্টা, এত কষ্টস্বীকার যে বৃথা ছবি!"—স্বর তার অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

ছবি বিরক্ত হয়ে বললে, "তোমার মাথা খারাপ হয়েছে!"

"বোধ হয়" ব'লে হঠাৎ ছবির হাতটা সজোরে ধ'রে ললিত উগ্রকণ্ঠে বললে, "চেঞ্জে আসবার টাকা কি ক'রে জোগাড় করেছি জানো ছবি? সন্তানকে পৃথিবীতে আনবার দায়িত্বে কি করেছি জানো?"

ছবি সে মুখের চেহারায় এবার অত্যন্ত ভয় পেয়ে বললে, "কি?"

"চুরি ক'রেছি,জুয়াচুরি করেছি, লুকিয়ে জাহাজের গাঁটরি বিক্রি করেছি। ভবিষ্যতের মানুষের দাবী মেটাতে অন্যায় করিনি নিশ্চয়!"

"তাহ'লে কি হবে!"—ছবির স্বর ভয়ে কাঁপছিল।

ললিত তিক্তমুখে হেসে বললে, "কিছু হবে না, ভয় নেই। সেইটুকুই মজা। এ চুরি কখনো ধরা পড়বে না। চিরকাল ধ'রে শুধু আমাকে খোঁচা দেবে।"

'পুন্নাম—'

ললিতের আকস্মিক উত্তেজনা কিন্তু যেমন বেগে এসেছিল, তেমনি বেগে শান্ত হয়ে এল।

দরজা খুলে বাইরে বারান্দায় সে বেরিয়ে গেল।

এবং শীতল স্নিগ্ধ অন্ধকারে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকার পর তার মনে হ'ল এতখানি ক্ষুব্ধ বিচলিত হবার বুঝি কিছুই কারণ নেই।

বিশাল আকাশ নক্ষত্রের আলোয় যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। তারি তলায় তার মনে হ'ল, এই মৌন সর্বংসহা ধরিত্রী যে যুগ-যুগান্তর ধ'রে বারবার আশাহত, ব্যর্থ হয়েও আজও প্রতীক্ষার ধৈর্য হারায়নি!

ভবিষ্যতের ভার

সেকেণ্ড পণ্ডিত মশাই-এর বয়স অনেক হয়েছে—ষাটের চেয়ে সত্তরের কাছাকাছি। দড়ির মত পাকানো লম্বা দেহটি, সামনের দিকে একটু নুয়ে পড়েছে। আজকাল গোঁফ-চুল সবই পেকেছে। চোখ বুজিয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বললেন, "আপনাকে নিয়ে এই পোনেরো জন হেড মাস্টারকে আসতে যেতে দেখলাম। আজকের কথা ত নয়—এ ইস্কুল সবে তখন আরম্ভ হ'ল। দশ আনির বড় কর্তা তখন বেঁচে, ভারি ভালো লোক ছিলেন! সেক্রেটারী তখন অনাথবাবু কিনা, তাঁকে ডেকে বললেন, 'আমার এই বা'র-বাড়িটা ত প'ড়েই থাকে, এর দুটো ঘরে তোমাদের ইস্কুল হয় না, হ্যা?'

"সেই বড় বড় দুটো ঘর নিয়ে ইস্কুল আরম্ভ হ'ল। সেকি আজকের কথা, এই এক-চল্লিশ বছর হ'ল!"

চোখ বুজিয়ে শীর্ণ মাথাটি একটু নুইয়ে একধারে কাৎ ক'রে কথা বলা পণ্ডিত মশাই-এর অভ্যাস। মুখখানা যৌবনে কি রকম

ছিল এখন দেখে কিছুতেই কল্পনা করা যায় না। এক একজন লোকের যৌবন ছিল ব'লে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। তারা যে-ভাবে জীবন আরম্ভ করে, শেষ যেন তেমনি ক'রেই করে।

দেহে বা মুখে অতিরিক্ত মাংস পণ্ডিত মশাই-এর এক রত্তিও নেই। কোনো কালে ছিলও না বোধ হয়। তাহ'লে চামড়া শিথিল হয়ে দু-একটা আরো রেখা মুখে দেখা যেত বোধ হয়।

প্রথম দেখলে মনে হয়, সে মুখ সদা-প্রসন্ন। বিশেষ লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, সে প্রসন্নতা মনের নয়, মুখের মাংসপেশীর মাত্র!

পণ্ডিত মশাই ব'লে যাচ্ছিলেন, "গবর্ণমেণ্টের ইস্কুল হ'লে এতদিন কবে পেন্‌সান পাবার কথা। ইস্কুল ঠাঁই নাড়া হ'লই ত ছ'বার।"—কথা কইতে কইতে পণ্ডিত মশাই-এর টিকেটা নিভে এসেছিল। চোখ চেয়ে তিনি তাতে আবার ফুঁ দিতে সুরু করলেন।

টিফিনের সময়ে মাস্টারদের বিশ্রাম করবার ঘরে ব'সে কথা হচ্ছিল। ঘরটি শুধু মাস্টারদের,—বিশ্রামের যতটা হোক বা না হোক, শয়ন আহারাদির বটে। ছোট ছোট বেঞ্চি জুড়ে এক পাশে সেকেণ্ড পণ্ডিত অন্য পাশে ফোর্থ পণ্ডিত মশাই-এর শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছেলেদের জল খাবার কলসীটাও ঘরের এককোণে থাকে,—আজ বাইরে রোদে শুকোতে দেওয়া হয়েছে। বহুদিন বাসি জল না ফেলা ও কেউ তদারক না করায় নাকি এত

বেশি পোকা হয়েছিল যে, ধমক দিয়েও ছেলেদের জলে পোকা হবার নালিশ বন্ধ করা যায়নি। অবশেষে কাল থেকে কলসীটাকে রোদে দেওয়া হচ্ছে। ঘরের এক দেওয়াল থেকে আর এক দেওয়াল পর্যন্ত পেরেক পুঁতে দড়ি খাটানো। তাতে পণ্ডিত মশাইদের ক'টি ময়লা ছেঁড়া কাপড়জামা ঝুলছে। সংখ্যায় সেগুলি অত্যন্ত কম, তাদের নতুন ব'লে ভ্রম করবারও কোনো উপায় নেই।

সেকেণ্ড পণ্ডিত মশাই বাইরে কোনো ছাত্রের বাড়ি পড়িয়ে খেয়ে আসেন।

ফোর্থ পণ্ডিত মশাই-এর খাবার ব্যবস্থাটা এইখানেই হয়। এক কোণে লোহার একটা তোলা উনুন, ক'টা অত্যন্ত নোংরা কলঙ্ক-পড়া পেতলের থালা বাটি বাসন ও গোটাকতক তরকারির খোসা প'ড়ে আছে। ঘরের সিমেণ্ট অধিকাংশ জায়গায়ই উঠে গেছে—জঞ্জাল ও ধুলো নির্বিঘ্নে বহুদিন ধ'রে সেখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ে—তাদের সে আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা সম্প্রতি আছে ব'লে মনে হয় না।

ফোর্থ পণ্ডিত মশাই-এর রান্নার দৌলতে এক ধারের দেয়াল কড়িকাঠ ও ছাদ ধোঁয়ার কালিতে স্থায়ীভাবে রঞ্জিত। অন্যান্য অংশে কালি না থাকলেও ঝুলের অভাব নেই। বিছানাটি জোড়া বেঞ্চির একধারে গুটিয়ে রেখে ফোর্থ পণ্ডিত মশাই কাপড় সেলাই করছিলেন। বিশেষ কাউকে উদ্দেশ না ক'রেই বললেন, "কাপড়ের দরটা তবু কিছু নেমেছে, কি বলেন?"

কেউ কিছুই বল্‌ল না। ফোর্থ পণ্ডিত মশাই উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করে সেলাই করে চললেন।

লোকটিকে সবাই একটু অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে—এমন কি নিরীহ সেকেণ্ড পণ্ডিত মশাই পর্যন্ত। চেহারাটি তাঁর ভক্তি বা সম্ভ্রম উদ্রেক করবার মত নয় বটে। মাথায় খাটো, চৌকোণা দেহটি মাথা থেকে পা পর্যন্ত আগাগোড়া কালো কালো বড় বড় লোমে আচ্ছন্ন—মুখে খোঁচা খোঁচা সুবৃহৎ গোঁফ-দাড়ির জঙ্গল। এই লোমশ কদাকার দেহটি তিনি আবার সর্বদা অনাবৃতই রাখেন —ধুতি ছাড়া আর কিছু তাঁর গায়ে কদাচিৎ দেখা যায়; ক্লাশে পড়াবার সময় একজোড়া খড়ম পায়ে থাকে বটে। কথা বেশি তাঁকে বলতে শোনা যায় না, কিন্তু যে ক'টি কথা কন্‌ তার অধিকাংশই অপ্রাসঙ্গিক ও উদ্দেশ্যহীন। কথা বলার পর নিজেই বোধ হয় নিজের নির্বুদ্ধিতায় লজ্জিত হন। কথাটা যেন তিনি বলেননি, এমনি ভাব দেখাবার চেষ্টা করেন তখন। লোকটির মুখে একটা সশঙ্ক দীনতার গভীর ছায়া আছে, নিজের ও পরের কাছে সর্বদাই যেন তিনি কি লাঞ্ছনা আশঙ্কা করছেন।

টিকে বেশ ধরে উঠেছিল; প্রস্তুত কল্‌কেটি হুঁকোর মাথায় চড়িয়ে হাতটি এগিয়ে দিয়ে সেকেণ্ড পণ্ডিত মশাই বললেন—"নিন্‌ মশাই!"

বললাম, "মাপ করবেন।"

হেড পণ্ডিত মশাই পেছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, হাত বাড়িয়ে

হুঁকোটা নিয়ে বললেন, "তামাক খান না, ওই সিগারেটগুলো খান ত! ও-গুলোর কাগজ যে মশাই থুতু দিয়ে জোড়ে—তা জানেন? সব ওই মেম মাগীদের থুতু—"

ঘৃণায় এক ধাবড়া থুতু পণ্ডিত মশাই ঘরের দেয়ালেই ফেললেন। তার পর হুঁকোর খোলটি ডান হাতের কর্কশ চেটো দিয়ে মুছে একটি টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—"পায়েস ছেড়ে আমানি!"

পণ্ডিত মশাই সকল দিক দিয়ে আদর্শ স্কুলের পণ্ডিত। কোনো খুঁত নেই, বয়স তাঁর চল্লিশের কিছু বেশি হবে হয়ত, কিন্তু মনের বয়স তাঁর নিরূপণ করা কঠিন। সে মন তিনি উত্তরাধিকার-সূত্রে কোন্ বৃদ্ধ-প্রপিতামহের সঙ্কীর্ণ জগৎ থেকে বহন করে এনেছেন। পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি সে-মনের সমস্ত সংস্কার ও দম্ভস্ফীত অন্ধতাকে লালন করেন।

যে বর্তমান পদে পদে তাঁর জগতের সব কিছুর মূল্য পালট করে দিচ্ছে, তার ভালো মন্দ সব কিছুকে নির্বিচারে দাঁত খিঁচোনই তাঁর একমাত্র সুখ। রক্তহীন শীর্ণ চেহারা; দীর্ঘকালের অজীর্ণ রোগ ও এই বিদ্বেষ মিলে মুখে একটা স্থায়ী বিরক্তির ছাপ এঁকে দিয়েছে। জুতো পায় দেন না—জামা গায় দেন না, উড়নি ও চাদর সম্বল। মোট কথা, কঠোর ভাবে তিনি ব্রাহ্মণের সমস্ত কর্তব্য পালন করেন। এবং সে জন্য তাঁর অহঙ্কারের সীমা নেই।

হুঁকোয় আরও দুটো টান দিয়ে বললেন, "তার চেয়ে বিড়ি ভালো।—ও ম্লেচ্ছর থুতু খাওয়ার চেয়ে ভালো।"

"A lot you know"—সেকেণ্ড মাস্টার মশাই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে সিগারেট সমেত ঠোঁট দুটি এক পাশে ফাঁক করে বললেন, "কি জানেন সিগারেটের? Have you any idea? কলে মিনিটে হাজার হাজার তৈরি হয়ে আসছে—untouched by hand—একি আপনার নোংরা হাতে গুড় আর তামাক পাতা চটকান!"

সেকেণ্ড মাস্টার মশাইয়ের বয়স অল্প। যেমন বেঁটে তেমনি রোগা। ভাঙা গালে ও বসা চোখে ঠুলির মত বড় গগল চশমাটা অত্যন্ত বিসদৃশ দেখায়। পা ফাঁক করে হাত পেছনে নিয়ে দাঁড়ালে ঠিক মর্কট বলে ভ্রম হয়। কিন্তু তাঁর পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ে জ্ঞান নাকি অসীম এবং সে জ্ঞানের পরিচয় তিনি সুযোগ পেলে কখনো দিতে ছাড়েন না।

হেড পণ্ডিত মশাই চটে গিয়েছিলেন। এক ধারের ঠোঁট ঘৃণাভরে একটু তুলে নোংরা কালো ক'টি দাঁত বার করে বললেন, "আপনি কি বিলেত গিয়ে দেখে এসেছেন? ওদের বিজ্ঞাপন পর্যন্ত ত দৌড়! ওরা সব ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির—সব ছাঁকা সত্যি কথাগুলি আপনার মত ভক্তদের জন্যে লিখে রেখেছে! বেদ মিথ্যে হবে তবু বিলেতে ছাপা বিজ্ঞাপন সে কি কখন মিথ্যে হতে পারে?—রামঃ—!"

সিগারেট আমি খাই না, সে কথা জানিয়ে তখন আর লাভ নেই।

তর্ক অনেকদূর চলত হয়ত। কিন্তু ছেলেগুলো হুড়-হুড় করে ঘরে এসে ঢুকে পড়ল।

"স্যার! টিফিনের ঘণ্টা হয়ে গেছে স্যার! তবু ফ'ণে ঘণ্টা বাজাতে দিচ্ছে না স্যার!"

হাঁপাতে হাঁপাতে নালিশটুকু শেষ করে ছেলেটা একটা ভয়ঙ্কর কিছু প্রতিবিধানের আশায় সমস্ত মাস্টারদের মুখের দিকে চেয়ে হাঁ করে রইল।

থার্ড পণ্ডিত মশাই দেহের তুলনায় অত্যন্ত অপরিসর একটি বেঞ্চের উপর শুয়ে এতক্ষণ নাক ডাকিয়ে একটু বিশ্রাম করে নিচ্ছিলেন, এখন স্থূল দেহভার অতি কষ্টে তুলে চোখ রগড়ে' বললেন—"সব হাড় ভেঙে দেব, পাজী কোথাকার, গোলমাল কিসের রে!"—তারপর আবেষ্টনটা স্মরণ হওয়ায় আমাদের দিকে চেয়ে একটু লজ্জার হাসি হেসে বললেন, "কি হয়েছে, এঘরে কেন?"

ছেলেগুলো এবার সমস্বরে পূর্বের নালিশের পুনরাবৃত্তি করল।

"কই, ঘণ্টা কোথায় দেখি চল্!"

"ফ'ণের কাছে স্যার!"

"চল্, ফ'ণের পিঠের আজ চামড়া থাকবে না।"

এসব কাজে থার্ড পণ্ডিত মশাই-এরই উৎসাহ বেশি; স্থূল

শিথিল দেহের সমস্ত মাংসপেশী প্রতি পদভরে নাচিয়ে তিনি ছেলের দলের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।

ফ'ণে স্কুলের দুর্দান্ত বিভীষিকা। প্রতিদিন সে স্কুলের একঘেয়ে ইতিহাসে একটি বিপ্লবের সৃষ্টি করে। সবাই পেছনে গেলাম; দেখা গেল ঘণ্টাটা টেবিলের ওপর যথাস্থানেই আছে। শুধু ফ'ণের কোনো চিহ্ন নেই এবং টিফিনের ছুটি মিনিট পোনেরো আগে শেষ হবার কথা।

ক'টা ছেলে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে চারিদিক খুঁজে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে খবর দিলে, "ফ'ণে, স্যার, দেয়াল টপ্‌কে পালিয়েছে—বইগুলো স্যার ফেলে গেছে কিন্তু"—ও থার্ডপণ্ডিত মশাই-এর বৃহৎ মুঠির গাঁট্টা খেয়ে নীরবে ক্লাশে গেল।

ঘণ্টা বাজল। মৌচাকের মত গুঞ্জনের সঙ্গে স্কুলের কাজ আরম্ভ হ'ল।

শহরতলির সামান্য বাংলা স্কুল।

সহরতলিটিও প্রাচীন ও দরিদ্র। যে নগণ্য পাকা বাড়িগুলি এখনো তার গৌরব রক্ষা করে তাদের সবারই অতি জীর্ণ দশা। রাস্তাগুলি অপরিসর ও অপরিষ্কার। এবং তারই ধূলোর ওপর দিয়ে প্রতিদিন সেখানকার তথাকথিত মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অতিকষ্টে করুণ সহিষ্ণুতার সঙ্গে নগ্ন দারিদ্র্যকে নামমাত্র আবরণে ঢাকবার কঠিন চেষ্টায় যাতায়াত করে।

প্রতিদিন সাড়ে দশটায় ভাঙা স্কুলবাড়ির আলোকবিরল পাঁচটি ঘরে তাদেরি শ'খানেক ক্ষীণদেহ পুত্র-পৌত্র জীর্ণ মলিন বেশে মানুষের বহুযুগসঞ্চিত জ্ঞান ও বিদ্যার উত্তরাধিকার গ্রহণের উপযুক্ত হবার আশায় এসে জড় হয়।

... ... ... ...

স্কুলের হেডমাস্টার। পোনেরো দিন হ'ল কাজে ঢুকেছি।

বাড়িতে মামা বলেন,—"এখন কাজে ঢুকেছিস্ থাক্—নেই মামার চেয়ে কাণামামা ভালো! কিন্তু চারিধারে নজর যেন ঠিক থাকে। যত পারিস অ্যাপ্লিকেশন্ করে যাবি, স্টেট্‌স্‌ম্যান রোজ পড়িস ত!"

চুপ করে থাকি।

মামা আরো বলেন, "সাধকরে কেউ কি আর মাস্টারি করে! বলে, দশ বছর মাস্টারি করলে গোরু হয়, বিশ বছরে গাধা! ছেলে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। পাঁচ বছর মাস্টারি করেছে শুনলে মার্চেণ্ট আপিসে ঢুকতেই দেয় না—"

মামার সব কথা কানে যায় না। অনেক সুবৃহৎ আশা ও কল্পনা মনকে অধিকার করে থাকে।

স্ত্রী ভাতের থালা রেখে বাতাস করতে করতে হয়ত বলে, "কিন্তু মাইনে যে বড় কম, চলবে ত?"

এবার মুখ খোলে।

"আজকের বাজারে চাকরি করলে, কী এর চেয়ে ভালো

করে চলত? বেলা দশটা থেকে রাত সাতটা পর্যন্ত হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে সাহেবের গালাগাল হজম করে না হয় আর ক'টা টাকা বেশি পেতাম। সে না হয় কেমিকেলের চুড়ি পরতে—আর এ না হয় কাঁচের চুড়ি পরবে—একি তার চেয়ে খুব খারাপ চলা হ'ল?"

বলতে বলতে খাওয়া থামিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠি। উমা তাড়াতাড়ি সাগ্রহে মাথা নেড়ে মতে সায় দেয়।

আরো উত্তেজিত হয়ে বলি, "এ কত বড় সম্মানের কাজ!"

"নিশ্চয়ই! তুমি কিন্তু মোটে খাচ্ছ না! ও-চচ্চড়ি আবার ফেলে রাখলে কেন?"

"এইযে,খাই।"—তাড়াতাড়ি কয়েকগ্রাস মুখে তুলে গিলে ফেলে বলি, "শুধু সম্মান? এ কত বড় কাজ বল দেখি! কেরানিগিরির সঙ্গে এর তুলনা হয়! না খেতে পেয়ে মরলেও যে এতে সান্ত্বনা থাকবে—কিছু করে মরলাম। এ ত আর মামা যা বোঝে সেই ছেলে-ঠেঙানো নয়। মানুষ জাতটাকে গড়ে তোলবার ভার আমাদের ওপর, তা জান? প্রাণ দিয়ে করলে এর চেয়ে বড় এর চেয়ে শক্ত কাজ আর আছে! বিলেতে, তুমি যা বললে বুঝবে—শুধু কি করে ছেলেদের শেখান উচিত তাই ঠিক করবার জন্যে কত লোক জীবনপাত করছে! এ ত আর মাটি-কাঠ-পাথর নিয়ে কাজ নয়, আসল মানুষ নিয়ে কাজ……"

"ও সেই তোমার আনা ওলটা, বুঝেছ না! খুব ত তেঁতুল

দিয়ে একবার সেদ্ধ করে ফেলেছি, আর বোধ হয় লাগবে না—লাগছে কি ?”

“না, বেশ লাগছে !”

“তবু লাগছে ?”

বিরক্ত হয়ে বলি, “আর কিছু ত বোঝ না—বাংলাটাও কি বুঝতে নেই ! বেশ লাগছে মানে ভালো লাগছে ।”

… … … …

স্কুলে যাই ।

থার্ড পণ্ডিত মশাই গেট্ থেকেই পরম পরিচিত শুভানুধ্যায়ীর মত সুপুষ্ট নাতিলঘু বাঁ হাতখানি কাঁধের ওপর রেখে এক পাশে টেনে নিয়ে যান ও সুবৃহৎ ফোলা মুখখানি মুখের অস্বস্তিকর রকম নিকটে এনে, হাপরের মত অতি গোপন ফিসফিস স্বরে বলেন, “নতুন এখানে ঢুকলেন ত ! হালচালও এখানকার কিছু জানেন না । তাই একটু সাবধান করে দিচ্ছি !”—সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ আরক্ত চোখ দুটি স্ফীত ও বৃহত্তর হয়ে তাঁর উপদেশ সমর্থন করে ।

তিনি বলে যান, “পরের কথায় হেলবেন না মশাই, কারুর না, এই যে আমি বলছি আমার কথাতেও না, ও আমার কাছে ন্যায্য-কথা,—আমি বলতে আর পীর নাই । একবারে আপ্‌রাইট অ্যাজ এ কোকোনট ট্রি । নতুন পেয়ে সবাই একবার বাজিয়ে দেখবে কিনা, দুনিয়ার নিয়মই এই ! কিন্তু বোল্ দেবেন একেবারে কাটা-কাটা—ঢিমে-তেতালা কখনো নয়, নেভার্ ।”

হাপুরে ফিস্‌ফিস্ ক্রমে স্পষ্ট হাঁড়িগলায় এসে পৌছোয়:
"একটু ফ্রেণ্ডলি অ্যাড্‌ভাইস্ দিলাম, কিছু মনে করবেন না যেন!"
একটি মোলায়েম হাসি দিয়ে মনে করবার সব কিছু মুছিয়ে দিয়ে হঠাৎ মুখটা আবার নামিয়ে এনে পণ্ডিত মশাই চুপি চুপি বলেন—"একটা মজা দেখবেন? হট্ করে আজ জিজ্ঞেস করে দেখবেন দেখি, সেভেন্থ ক্লাশের রেজেষ্ট্রীতে চৌদ্দজনের নাম, আর ক্লাশে পোনেরো জন হয় কি করে! অমনি ঘুরতে ঘুরতে ক্লাশ ঢুকে বেটপ্‌কা জিজ্ঞেস করে বস্‌বেন, বুঝেছেন? তারপর দেখবেন রগড়-খানা! অনেক মজা আছে মশাই এইটুকুর মধ্যে—বহুত রগড়—"

হঠাৎ সুর বদ্‌লে পণ্ডিত মশাই বলেন, "চলুন!"—এবং স্কুলে ঢুকতে ঢুকতে আর একবার স্মরণ করিয়ে দেন, "সেভেন্থ ক্লাশে, বুঝেছেন! অমনি বেটপ্‌কা জিজ্ঞেস করে বসবেন!"

মনটা দমে যায় একটু হয়ত।

ঘণ্টা বাজে। স্কুল বসে। পাশের ঘরের গোলমালে পড়ান যায় না। উঠে গিয়ে দেখি, সেকেণ্ড মাস্টার মশাই এসে পৌছন নি; কোনদিনই তিনি সময়ে এসে পৌছন না। ছেলেগুলোকে নিজের ক্লাশে নিয়ে এসে বসাই।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে দু'খানা মোটা মোটা বই হাতে করে সেকেণ্ড মাস্টার মশাই আসেন। বইগুলোর নাম পড়া যায় এমন ভাবেই টেবিলের ওপর রেখে বলেন, "আপনি আবার কষ্ট করে এ-ঘরে এসেছেন! কিছু দরকার ছিল না।" বইগুলোর দিকে

তাকিয়ে বলেন, "পড়বেন নাকি একখানা? নিন্‌না, ওয়েল্‌সের এখানা নিন্—গর্কিরখানাও নিতে পারেন, যেটা খুশি—! আমার ওসব দু'দু'বার পড়া হয়ে গেছে, তবু আবার পড়ি—স্‌প্লেণ্ডিড্ বুকস্! কোন্‌টা দেব?"

বিনীতভাবে বলি, "এখন পড়বার সময় হবে না।"

বইগুলো তুলে নিয়ে করুণামিশ্রিত অবজ্ঞার সঙ্গে তিনি বলেন, "এ-সব বালাই বুঝি নেই আপনার? মন্দ নয়; আমার কিন্তু মীট্ এ্যাণ্ড ড্রিঙ্ক্ মশাই।"

রুগ্‌ণ বিবর্ণ ফ্যাকাশে মুখ ও শীর্ণ খর্ব দেহ দেখলে সে কথা বিশ্বাস হয় বটে!

ছেলেদের ডেকে নিয়ে, দেরি হবার জন্যে বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে, তিনি চলে যান।

দেরি করা সম্বন্ধে কয়েকদিন ধরেই বলব বলব করেও কিছু বলতে পারছি না।

আবার পড়ানয় মন দিই। ফার্স্ট ক্লাশের তিনটি মাত্র ছেলে। কুঁজো হয়ে বুড়োর মত মাথা নিচু করে নির্জীবের মত আনমনা ভাবে চুপ করে থাকে। এক এক সময় মিছেই বকে মরছি মনে হয়, মনে হয় কিছুই শুনছে না। চোদ্দ পোনেরো বছর সব বয়স—মুখে জৌলোষ নেই—চোখে জ্যোতি নেই!—হঠাৎ নিজের ওপর বিরক্তি ধরে। মনে হয়, আমার শুষ্ক বই-এর ব্যাখ্যার চেয়ে আলো বাতাস ও পুষ্টির এদের ঢের বেশি প্রয়োজন।

তবু পড়িয়ে চলি। কোথা থেকে, মাঝে মাঝে একটা অত্যন্ত দুর্গন্ধ আসে। ছেলেগুলো মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে—নাকে কাপড় দেয়।

"কিসের দুর্গন্ধ বল ত?"

ক্ষ্যাপাটের মত একটা অত্যন্ত নোংরা রোগা ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে ছেঁড়া কোটের নিঃসঙ্গ বোতামটিকে বাঁহাতে নাড়তে নাড়তে বোকার মত হেসে হড়-বড় করে বলে, "পায়রা পচেছে স্যার, ওই যে পায়রাগুলো আছে স্যার, তাই খোপের মধ্যে পচে গেছে স্যার, প্রায় স্যার পচে যায়। ভয়ানক গন্ধ স্যার! হোয়াক্ থু!"—ছেলেটা জানালায় গিয়ে থুতু ফেলে।

বারান্দায় কার্নিশের ওপর অনেকগুলো পায়রা থাকতে দেখেছি বটে।

উৎকট দুর্গন্ধ। একটা কিছু বিহিত করা দরকার।

মাস্টার মশাইরা বলেন, "ওখানে কে উঠবে মশাই। ও অমনি খানিক বাদে গন্ধ আপনিই যাবে'খন।"

বেয়ারাটা বিনা সিঁড়িতে অতদূর উঠতে পারবে না বলে।

বাইরে যাবার ছুতো করে ছেলেগুলো বাইরে এসে দাঁড়ায়, দাঁড়িয়ে দেখে।

মাস্টাররা নাকে কাপড় দিয়ে এসে ওপর দিকে চেয়ে মাথা নাড়েন।

সেকেণ্ড মাস্টার মশাই রুমাল নাকে দিয়ে বলেন, "রট্‌ন্ প্লেস, পায়রাগুলো পর্যন্ত রট্‌ন্।"

একটা ছেলে হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার ও কৌশলের সঙ্গে জানালার গরাদে, দরজার মাথা ইত্যাদি ব্যবহার করে অর্ধেক পথ উঠে গিয়ে বলে, "আমি উঠে পেড়ে দেব স্যার ?"

"আমি উঠে পেড়ে দেব স্যার !" ভেংচিয়ে ছড়ি তুলে থার্ড পণ্ডিত মশাই বলেন, "তোমায় কে বাহাদুরি দেখাতে বলেছিল বাঁদর ? নেমে এস, দেখাচ্ছি—সব কাজে বাঁদরামি !"

তাঁকে থামিয়ে বলি, "পারে যদি উঠুক্‌না ; আর কোনো রকম বন্দোবস্ত যখন হচ্ছে না—"

"আস্কারা পায় মশাই !"

ফ'ণে ততক্ষণ কারুর কথা শোনবার অপেক্ষা না রেখে দরজার মাথায় গিয়ে উঠেছে। কড়িকাঠের ফোকরের ভেতর হাত ভরে একটা মরা আধপচা পায়রার ছানা বার করে হেসে বলে, "পায়রার ছানা স্যার ! পায়রাগুলো হাতে আবার ঠুক্‌রে দেয় !"

ছেলেটা স্কুলের চক্ষুশূল এবং নিরবচ্ছিন্ন শান্তির একমাত্র ব্যাঘাত। তবু ছেলেটার উজ্জ্বল দুষ্টুমিভরা চোখ দুটি, কেমন যেন ভালো লাগে। এখানকার নির্জীব স্থবিরতার মাঝে ও-ই যেন একটুখানি সজীব চঞ্চলতা—!

দুর্গন্ধ পচা পায়রার একটা কিনারা হয়। মাস্টার ও ছেলেরা

আবার ঘরে গিয়ে ঢোকে। থার্ড পণ্ডিত মশাই যাবার সময় আর একবার ইসারা করে তাঁর কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যান।

একটু ঘুরে দেখতে বেরোই।

সেকেণ্ড মাস্টার মশাই বই পড়ছিলেন। আঙুল রেখে সেটি মুড়ে অত্যন্ত অলস ভাবে ঈষৎ বিরক্তিভরে উঠে দাঁড়ান। ছেলেগুলো লেখা থামিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

বলেন, "আমার মেথড্ হচ্ছে কী জানেন—খালি লেখা, ছেলেদের খালি লিখতে দেওয়া। আমি এই ছ-মাসে এ মেথডে ওয়াণ্ডারফুল রেজাল্ট পেয়েছি। শুধু মুখে পড়ানর চেয়ে এ ঢের এফেক্‌টিভ্। চোখ, কান ও হাতের সেন্সেশান্ সমস্ত দিয়ে ব্রেন নলেজ্‌টা রিসিভ্ করে কিনা!" একটু দর্পের হাসি হেসে আবার বলেন, "কাজটাতে একদম আমার লাইকিং নেই যদিও, তবুও মেথড্ অফ্ টিচিং নিয়ে একটু আধটু এক্সপেরিমেণ্ট্ করেছি;— আপনি 'ড্যাল্টনের মেথড্' সম্বন্ধে পড়েছেন নিশ্চয়!"

শুক্‌নো একচিম্‌টে মানুষটির ছোট্ট মুখের অর্ধেকের বেশি 'গগ্‌ল'টাই অধিকার করে আছে। ওইটুকু মুখ থেকে এই সব অহঙ্কারের কথা ভারি হাস্যকর লাগে।

বলি, "ছেলেদের 'অ্যাটেণ্ডেন্স'টা এ ক'দিন খাতায় তুলতে ভুলে গেছেন, অনুগ্রহ করে আজ তুলে রাখবেন।"

"ও, 'সরি'—মনে ছিল না।"

যেতে যেতে বুঝতে পারি লোকটি অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে আমার দিকে চেয়ে আছেন—।

একই ঘরের দুই প্রান্তে হেডপণ্ডিত ও থার্ড পণ্ডিত মশাইএর ক্লাশ।—টুঁ শব্দটি নেই। দুইজনেরি বিশ্বাস তাঁর মত ডিসিপ্লিন্ কেউ রাখতে জানে না এবং প্রত্যেকেই অপরের এই 'ডিসিপ্লিন্' রাখবার ক্ষমতাকে অত্যন্ত অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। এক ঘরে দুজনার ক্লাশ থাকলে আর রক্ষে নেই। দুজনে প্রতিযোগিতা করে ডিসিপ্লিন্ রাখতে সুরু করেন।

ছেলেরা পাংশুমুখে সভয়ে নিশ্বাসটুকু পর্যন্ত টানতে দ্বিধা করে।

নিস্তব্ধ ক্লাশে শুধু দুই পণ্ডিত মশাইএর গলা শোনা যায়—মাঝে মাঝে।

"পেন্সিল ঠুকছে কে রে! শব্দ-টব্দ করা চলবে না বাপু; এটা মামার বাড়ি নয়,—ইস্কুল। এদিকে আয় দেখি।"

চপেটাঘাতের শব্দ শোনা যায়।

প্রত্যুত্তরে থার্ড পণ্ডিত মশাই এক পর্দা চড়িয়ে ধরেন,—

"পা দোলাচ্ছিস কেন রে কেষ্টা? কি বলে দিয়েছি আমি কাল? শুধু চুপ করে থাকলেই আমার ক্লাশে সাত খুন মাফ্ হবে না বাপু, এ বড় কঠিন ঠাঁই, হাত, পা, মাথা কিচ্ছু নড়বে না—একেবারে পুতুলটি হয়ে থাক্‌তে হবে।"

হেড পণ্ডিত মনে মনে বোধ হয় এর পাল্টা চাল খোঁজেন।

নিস্তব্ধ ক্লাশ ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকে।

থার্ড পণ্ডিত মশাই ইসারায় আমায় সে কথাটা আর একবার স্মরণ করিয়ে দেন।

ফোর্থ পণ্ডিত মশাইএর ক্লাশে অত্যন্ত গোলমাল—

হেড পণ্ডিত ও থার্ড পণ্ডিত মশাইএর শাসনে রুদ্ধবেগ সমস্ত দৌরাত্ম্য সুদ সমেত তারা ফোর্থ পণ্ডিত মশাইএর ক্লাশে মুক্ত করে দেয়।

কেউ তাঁকে মানে না। চারিধারে ভিড় ক'রে দাঁড়ায়। পণ্ডিত মশাই পাখার বাঁট দিয়ে এলোপাথাড়ি প্রহার ক'রে তাড়াবার চেষ্টা করেন। ছেলেদের ভারি একটা খেলা মনে হয় বোধ হয়। পাখার বাঁটের নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে তারা হাসতে থাকে।

"স্যার, নগেন স্যার, চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে।"

"না স্যার"—অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে নগেন নিজের জায়গায় গিয়ে হাসে।

অগত্যা পণ্ডিত মশাই ওঠেন, দাঁত খিঁচিয়ে বলেন, "সক্কলের এক ঘা ক'রে বেত।"—এবং পরক্ষণেই দাড়িগোঁফের জঙ্গল ভেদ ক'রে অকারণ হাসিটুকু প্রকাশ পায়।

ছেলেরা হৈ চৈ করে,—"হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার!" এবং স্বেচ্ছায় হাত বাড়িয়ে হাসে।

পণ্ডিত মশাই পাখার বাঁটের এক এক ঘা ক'রে মেরে যান।

"হ্যাঁরে অনিল, তোর না ফাস্ট বেঞ্চিতে জায়গা?"

ছেলেরা চীৎকার ক'রে বলে, "হ্যাঁ স্যার, ও একবার মার খেয়েছে স্যার, আবার খাবার জন্যে নেমে এসে বসেছে স্যার—!"

"আর তোকে মারব না ত।"

অনিল অনুনয় ক'রে বলে, "আর একবার স্যার!"

একটা ছেলে চেঁচিয়ে জানায়, "ওই আপনার ডাল ভিজে গেল স্যার, বৃষ্টি পড়ছে।"

পণ্ডিত মশাইএর ডাল রকে খবরের কাগজের ওপর শুকোয়। তাড়াতাড়ি মার ফেলে পণ্ডিত মশাই ডাল তুলতে দৌড়োন। সত্যিই বৃষ্টি পড়ছে।

ধীরে ধীরে সেখান থেকে চ'লে আসি। কিছু বলতে পারি না কেন জানি না। আসবার পথে দেখি, বৃদ্ধ সেকেণ্ড পণ্ডিত মশাই ক্লাশে টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। মাথাটা চেয়ারের পেছনে কাত হয়ে ঝুলে পড়েছে। ঘুমন্ত মুখ তাঁর চিরপ্রসন্নতার আভাস হারিয়ে অত্যন্ত ক্লান্ত ও কাতর দেখায়।

আবার টিফিনে ফ'ণের নূতন কীর্তির তদন্ত করতে হয়। সেকেণ্ড পণ্ডিত মশাইএর ঘুমোবার সময় সে নাকি রেজেষ্ট্রী খুলে—সমস্ত অনুপস্থিত চিহ্নগুলি উপস্থিতের চিহ্ন ক'রে দিয়েছে। শুধু নিজের নামটি ক'রেই সে নাকি ক্ষান্ত থাকেনি, অত্যন্ত পরার্থপরতার সঙ্গে ক্লাশের সকলকেই নিজের গৌরবে সমান অধিকার দিয়েছে।

স্কুলের দিন এমনি ক'রে কাটে।

কাপড় কেনাটা এবারে না হয় থাক্—উমা বলে।

বুঝি সবই। তিনমাস ধ'রে অত্যন্ত পুরোনো কাপড় দুটো সেলাই ক'রে কোন রকমে চালাবার ইতিহাসটাও তার জানি। তবু চুপ ক'রে থাকি। কিছুদিন ধ'রে আর একটা টিউশনির চেষ্টা দেখছি; এখনো জোগাড় ক'রে উঠতে পারিনি।

"মুদি কাল আবার এসেছিল, ওর আর কেরোসিন তেল-ওয়ালারটা দিয়ে দিলেই এখন চল্‌বে। অন্যগুলো দুদিন দেরি করলে ক্ষেতি নেই।"—একটু হেসে উমা আবার বলে, "খোকার জামার কাপড় আর কিনতে হবে না, তোমার সেই ছেঁড়া শার্টটা থেকে খোকার কেমন জামা করেছি দেখবে?"

অত্যন্ত খুশি : ভাণ ক'রে উমা তাড়াতাড়ি জামাটা এনে দেখায়। হাসিমুখে বলি,—"বাঃ, চমৎকার হয়েছে ত! ওই ছেঁড়া জামাটা থেকে এমন সুন্দর হ'ল? তুমি দেখছি অ্যারেবিয়ান্ নাইট্‌সের জাদুকরী!"

এবার সত্যিকারের আনন্দে তার মুখ উজ্জল হয়ে ওঠে, বলে, "তোমার সব কথায় ঠাট্টা!"

কিন্তু আনন্দটাকে বেশিক্ষণ রাখা যায় না। কখন দেখি তা উবে গেছে।

মনে মনে সঙ্কল্প করি, এবার আর একটা টিউশনি জোগাড় করবই।

ম্লানমুখে উমা এক সময়ে বলে, "মামারা আর এখানে আসবেন না, বোধ হয় কিছু মনে ক'রে গেছেন।"

"কেন ?"

"যত্ন-টত্ন কিছুই ত করতে পারিনি। সত্যি তাঁদের ভালো ক'রে যত্ন না করতে পেরে এমন লজ্জা হ'ত !" ব'লে উমা একটু হাসবার চেষ্টা করে। তারপর বলে, "তাঁরা ত আর রোজ আসেন না, পাঁচ দশ বছরে একবার ! তাও যত্ন করতে পারলাম না !"

সত্যি কথা। কিন্তু যত্ন না করতে পারাতেই মুদির কাছে দ্বিগুণ ঋণ হয়ে গেছে। স্বজনপ্রীতি হয়ত অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত জিনিস, কিন্তু তার পরিচয় দেবার সৌভাগ্য সকলের নয়। আত্মীয়স্বজন আসার আনন্দের পেছনে অত্যন্ত স্থূল অত্যন্ত হীন দুর্ভাবনাটাকে কোনরকম ধমক দিয়েই চেপে রাখবার উপায় নেই।

"তুমি অত ভাবছ কেন বল ত ? এ-মাসে না হয়, আর-মাসে কাপড়চোপড় কিনলেই ত হবে। ত্রিশটা দিন বই ত নয়—ও-মাসে ত আর উপরি খরচ নেই।"

কিন্তু ও-মাসেও হয় না।

হঠাৎ ডাক্তার ও ডাক্তারখানার বিল বেড়ে ওঠে।—খোকার অত্যন্ত অসুখ। অনেক কষ্টে সেরে ওঠে।

উমা বলে, "দেখ, এ-মাসটাও কাপড় না হ'লে চ'লে যাবে। সেমিজটায় তালি লাগিয়ে নিয়েছি, কাপড়ের তলায় থাকবে, তালি থাকলেই বা কে দেখতে যাচ্ছে।"

খানিক থেমে বলে, "তোমার জুতো জোড়াটা যেন এবারেও কিনতে ভুলে যেও না।"

"পাগল হয়েছ! আমি নেহাৎ আহাম্মুক তাই জুতো কিনব বলেছিলুম। হাফ্‌সোল আর হীল লাগিয়ে এই তিনটে জায়গায় তালি দিলে এ জুতোকে আর ছ'মাসের মতো দেখতে-শুন্‌তে হবে না। কি রকম মজবুত জুতো এ—!"

উমা কি জানি কেন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে—।

খানিক বাদে বলে, "খোকার একটা বিলিতি দুধ এনো!"

"এই সেদিন বিলিতি দুধ এল, এর মধ্যে ফুরিয়ে গেল! এ রকম খরচ করলে ত পারা যায় না।"—একটু বিরক্তই হই।

মুখ ম্লান ক'রে উমা বলে—"এ রকম আর কী খরচ করি, ডাক্তার তবু কতবার ক'রে খাওয়াতে বলেছিল, আমি ত শুধু সকালে একবার রাত্রে একবার খাওয়াই, আর বাকি ত শুধু অ্যারারুট দিই।"

জোর ক'রে বলি—"ডাক্তাররা ও রকম ঢের বলে। অ্যারারুট বেশি ক'রে দিও। বিলিতি দুধ যখন ছিল না তখন আর এদেশে ছেলে বাঁচত না?" নিজের বেদনাময় সন্দেহের কাঁটাটাও বোধ হয় ওই দিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করি।

ইন্‌ফ্যাণ্ট ক্লাশের ছেলেগুলো বসতে পায় না, মাটিতে বসে। ক'টা বেঞ্চির অত্যন্ত দরকার। ঘরটাও বড় অন্ধকার; পেছন দিকে একটা জানালা ফোটালে ভালো হয়।

সেক্রেটারী মশাই অত্যন্ত ভদ্রলোক, কিন্তু তাঁর হাত নেই। বললেন, "বোর্ড থেকে না হুকুম দিলে আমি ত কিছু করতে পারি না।"

অনেক দিন বাদে বোর্ড থেকে সংবাদ এল। জানলাটা সম্বন্ধে এখন কিছু করা যায় না। জানলার পেছনের জায়গাটাই অপরের। তারা বোধ হয় জানলা খুলতে দেবে না। তা ছাড়া, বাড়িওয়ালা থাকেন বিদেশে, তিনি জানলা হয়ত খুলতে চাইবেন না—ইত্যাদি অনেক হ্যাঙ্গামা। সুতরাং জানলা খোলা হবে না

বেঞ্চি সম্বন্ধে কথা এই যে, ইন্‌ফ্যাণ্ট-ক্লাশের ছেলের সংখ্যার কিছু ঠিক নেই। কখনও বাড়ে কখনও কমে। সুতরাং তার জন্যে স্কুলের টাকার এই টানাটানির সময় বেঞ্চি কেনা সুবুদ্ধির কাজ নয়। অন্য ঘর থেকে একটা নিয়ে চালিয়ে দিলেই হবে।

হয়ত কথাগুলো বিবেচকের মত। কিন্তু মনটা ভালো নেই। কিছুদিন আগেই বোর্ড থেকে এক রহস্যময় আদেশ এসেছে মাস্টারদের ওপর—আর স্কুলে নির্দিষ্ট পাঠ্যের অতিরিক্ত কিছু পড়িয়ে যেন সময় নষ্ট করা না হয়।

প্রথমটা কিছু বুঝতে পারিনি। হঠাৎ একদিন মনে হ'ল মাঝে মাঝে বাইরের বই থেকে ছেলেদের আমি গল্প-গাছা বলি বটে। সেটা দূষণীয় ভাবিনি এবং তা লুকোবার কোনো চেষ্টাও আমার ছিল না। কিন্তু সে সংবাদ বোর্ডের কানে হঠাৎ গেলই বা কি-ক'রে তাও বুঝতে পারি না।

কিছুদিন আগে ইন্‌ফ্যান্ট-ক্লাশকে একঘণ্টা আগে ছুটি দেওয়ার নিয়ম নিয়েও একটু গোল হয়েছে।

হুকুম এসেছে—"অনুগ্রহ ক'রে প্রচলিত নিয়ম পরিবর্তন করবেন না।"

পাঠ্য-পুস্তকের তালিকা সম্বন্ধে নতুন প্রস্তাব করতে গিয়েও অমনি বিফল হয়েছি।

থার্ড পণ্ডিতমশাই একধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছেন, "আপনারা ছেলেমানুষ—এখনও সরল প্রকৃতির, ওসব সংসারের মার-প্যাঁচ ত এখনও বোঝেন না। আপনি সরল মনেই গেলেন নতুন বই বদ্‌লাতে, লোকে ত আর তা বুঝবে না। তারা ভাবলে, আপনি বইওলাদের কাছে ঘুষ খেয়েছেন। ও-রকম খায় যে মশাই! আপনি যে সরল মানুষ তা ত আর লোকে বুঝবে না……"

সমস্ত গা'টা কেমন যেন রী-রী করে উঠেছে। পণ্ডিতমশাই-এর আকস্মিক অন্তরঙ্গতার কারণও বুঝে উঠতে পারিনি। স্কুলে ঢোকবার প্রথম দফাতেই তাঁর সঙ্গে তাঁর একটা অনুরোধ নিয়ে একটু কষাকষি হয়েছিল।

অনুরোধ না রাখার পরের দিনই তিনি হঠাৎ টিফিনের সময় নিজে থেকেই ব'লে উঠেছিলেন, "হেডমাস্টার মশাই বলছিলেন, সব ছেলের নাম ত রেজেষ্ট্রীতে নেই—সেটা ত ভালো কথা নয়।"

অত্যন্ত 'কিন্তু' হয়ে ফোর্থ পণ্ডিতমশাই বলেছিলেন, "দেখুন, এই

তিনদিন বাদেই ওর বাপ এসে ভর্তি ক'রে দেবে, এই ছদিন অমনি বসছে। অমনি আসে, আমি আর বারণ করতে পারি না······"

অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলাম,—"আমি ত এ-রকম কোনো কথা বলিনি, আপনিই ত বরং আমায় এ খোঁজটা করতে বলেছিলেন থার্ড পণ্ডিতমশাই !"

সেইদিন থেকে পণ্ডিতমশাই একটু এড়িয়ে এড়িয়ে চলতেন। হঠাৎ তাই এই আত্মীয়তা একটু বিস্ময়কর লাগল সেদিন।

টিফিনের ঘণ্টায় বিশ্রাম-ঘরে চুপ ক'রে ব'সে থাকি। কোথাকার রেলভাড়া ক'পয়সা কমেছে উৎসাহের সঙ্গে সেই আলোচনা চলে।

পাশে ব'সে সেকেণ্ড মাস্টার থার্ড পণ্ডিতমশাইকে কোন্ কোন্ বড় বড় সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর কিরূপ অন্তরঙ্গতা আছে তারই গল্প বলেন। তিনি যে নিজেও একজন সাহিত্যিক এ-কথা সম্প্রতি তিনি প্রকাশ করেছেন এবং এই বিস্ময়কর সংবাদ প্রকাশ হবার পর থেকে নিজেদের সৌভাগ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সমস্ত স্কুল একটু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ছাড়াছাড়া দু'একটা কথা শুনতে পাই—

"এ ইস্কুলে আর ক'দিন আছি বলুন······কি জানেন, ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কের সঙ্গে এসব কাজ করা চলে না······কোনরকমে প'ড়ে আছি বই ত নয়······লেখাটা পেইং হ'তে আমাদের দেশে একটু দেরি লাগে কিনা···বিশেষত ভালো লেখা······বিলেতে হ'লে কি আর ভাবতে হ'ত! নতুনের কদর কি এদেশে বোঝে······"

এই ছোট্ট শুকনো মানুষটির দৃঢ় বিশ্বাস, হতভাগ্য এই দেশ অত্যন্ত নির্বোধ ব'লেই তাঁর অসামান্য প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান অবিলম্বে দিতে পারছে না। পণ্ডিতমশাইও শোনেন ব'লে মনে হয় না।

এই নিত্যনৈমিত্তিক একঘেয়েমি অসহ্য বোধ হয়। হাঁপিয়ে উঠি।

ফ'ণেও স্কুল ছেড়ে দিয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে স্কুল চলে।

তার শেষ কীর্তি পকেটের ভিতর জ্যান্ত হেলে সাপ এনে ক্লাশের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া। থার্ড পণ্ডিতমশাই-এর কাছে বেদম মার খেয়ে তারপর সে আর স্কুলে আসেনি। তার বাপ এসে স্কুলে ব'লে গেছে—তার নাকি বিদ্যা হবার কোনো আশা নেই—সবাই তাই বলে।

ছু'একটা ছেলে এসে খবর দিয়েছিল—সে নাকি এবার তার বাপের ব্যবসা দেখবে। সবাই বলেছিল—"বেণের ছেলে ত!"

ছুটো টিউশনিই গেছে।

খোকার অত্যন্ত লিভারের দোষ হয়েছে। চিকিৎসা চলছে।

আজকাল আবিষ্কার করেছি, রাত্রে শুধু ছুটি ছাতু খেয়ে থাকলে শরীর ভারি হাল্কা থাকে, অজীর্ণ হবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

উমা বলে,—"ও-সব সেমিজ-টেমিজ আজকালের ফ্যাশান বই

ত নয়! বয়স হয়েছে, আর বাপু লজ্জা করে পরতে—তা সেকেলে বলুক আর যাই বলুক লোকে।”

উমার বয়স উনিশ হয়েছে বটে।

সেদিন অতি কষ্টে রাগ সামলেছি।

মাথাটা সকাল থেকে অত্যন্ত ধরা। তবুও পড়িয়ে যাই।

পড়াতে পড়াতে একটি ছেলের প্রতি কেমন সন্দেহ হয়—শুনছে না। জিজ্ঞাসা করলে কিছু বলতে পারে না। ধমক দিয়ে আবার পড়াতে আরম্ভ করি।

হঠাৎ চোখে পড়ে ছেলেটা বই আড়াল দিয়ে অন্য কী পড়ছে।

বই-এর পেছনে ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস ধরা পড়ে!

সমস্ত রক্ত যেন এক মুহূর্তে মাথায় উঠে যায়—

“পাজী কোথাকার! আমার মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে আর তুমি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়ছ!”—কান ধ’রে হিড় হিড় ক’রে ছেলেটাকে টেনে নিয়ে আসি।

নিজের পৈশাচিক রাগে নিজেই হঠাৎ বিস্মিত হয়ে তাকে ছেড়ে দিই। সামান্য কারণে এমন রাগ ত আমার কখনো হ’ত না!

এবার বর্ষাটা বড্ড বেশিদিন ভোগাচ্ছে। জুতোটা আরো দু’মাস বেশ পায়ে-দেওয়া যেত। বর্ষার জন্যেই যা অনবরত ভেতরে জল ঢুকছে। তাব’লে এই ক’দিন বর্ষার জন্যে এমন

জুতোটা ফেলে দিয়ে আবার এক জোড়া কেনা ত আর যেতে পারে না !

সর্দিটা বোধ হয় এই ভিজে পায়ে থাকার জন্যেই বাড়ছে। মাথাটা আজকাল রোজই ধরে। কেমন যেন গায়ে জোর পাই না।

উমা চিন্তিত ভাবে মুখের দিকে চেয়ে বলে—"তোমার কিন্তু গালার হাড় দেখা দিচ্ছে! তুমি আজকাল মোটে ভালো ক'রে খাও না।"

হেসে তার পিঠ চাপড়ে' বলি, "হাড় থাকলেই দেখা যায়—"

স্কুলের শেষ দুটো ঘণ্টা মাথার যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে ওঠে।

ডাক্তার বলেছে, "কিছুদিন রেস্ট নিন্ না—আপনিই সেরে যাবে।" বলি, "হ্যাঁ, এইবার নেব ভাবছি—আচ্ছা এর কোনো ওষুধ-টোষুধ দেওয়া চলে না ত ?"

"কিছু না। শুধু বিশ্রাম নিলে আপনি সেরে যাবে।"

ক্লাশে শেষ দুঘণ্টায় কিছুতেই বই খুলে পড়তে পারি না।

আর সত্যিই মাঝে মাঝে লিখতে দেওয়া ত আর খারাপ নয়। লেখাটাও ত দরকার। আমি ত আর ফাঁকি দেবার জন্যে লেখাচ্ছি না—লেখার ভেতর দিয়েও ত ছেলেদের বেশ আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া যায়। ভেবে-চিন্তে লেখার একটা খেলাও ত বার করা যেতে পারে।

ছেলেদের বলি—"কে কোন্ অক্ষর নিবি বল্।"

"এফ, স্যার"—"আর"—"সি"……

"বেশ। আজকের পড়া থেকে নিজের নিজের অক্ষর যে-ক'টা কথার আগে আছে খুঁজে-খুঁজে খাতায় লিখে ফেল দেখি। দেখি কার ভাগ্যে ক'টা অক্ষর পড়ে।"

বেশি ক'রে ছেলেদের আর বোঝাতে হয় না। কদিন ধ'রেই তারা এ খেলা করছে—জানে। তারা উৎসাহের সঙ্গে বলে, "হ্যাঁ স্যার।"

এইত বেশ লেখার পদ্ধতি! ধরতে গেলে মাথা থেকে বেশ ভালে মতলবই বেরিয়েছে—!

একটা ছেলে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি খাতা দিয়ে বলে, "আমার 'ওয়াই' ছিল স্যার, হয়ে গেছে।"

"আচ্ছা এবার 'ই' ধর—"

ছেলেরা কী বোঝে জানি না; কেউ আর খাতা নিয়ে আসে না।

হঠাৎ ঘণ্টার শব্দে জেগে উঠি।

চম্‌কে দেখি—

ঘুমোচ্ছিলাম…

টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে চেয়ারের পিঠে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিলাম!

সকাল হইতে না হইতে বুড়া কৃত্তিবাস লাঠি ঠুক ঠুক করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। অত্যন্ত সন্তর্পণে বাহিরের দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া যায়—মেয়ে জানিতে পারিলে আর রক্ষা নাই।

জানিতে যে পারে না তাও নয়। গভীর রাত্রে আবার ঘরে ফিরিতেই হয়, তখন দরজা খুলিয়া দিয়া সুশীলা যে কথাগুলি শুনাইয়া দেয় অন্যায় না হইলেও সেগুলি বড় কটু।

কিন্তু রাত্রি, সে অনেক দূরের কথা। জীবনের নিশা যাহার নিকট হইয়া আসিয়াছে তাহার কাছে প্রভাত হইতে রাত্রি অনেক দূর মনে হয়। অত দূরের কথা ভাবিবার প্রয়োজন হয় না।

এমন রোজই হয়। রাত্রে দরজা খুলিয়া দিয়া সুশীলা বলে, 'বুড়ো বয়সে তোমার লজ্জাও করে না বাবা! একলা মেয়েছেলে দুটো ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে যে সকাল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত এই বাড়িতে একলা পড়ে থাকি, তার জন্য একটু ভাবনাও হয় না! আমরা মরলাম কি বাঁচলাম বাপ হয়ে সেটা দেখবার কি দরকার নেই?"

কৃত্তিবাস বিজ বিজ করিয়া কিযে বলে বোঝা যায় না। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া কলিকাটা তুলিয়া লইয়া ছাই ঝাড়িতে ঝাড়িতে সঙ্কুচিত হইয়া বলে, "দেখ্ আজ আর খাব না, পেটটা কেমন যেন ফেঁপেছে।"

"তা জানি, নাজির জ্যেঠার ওখানে খেয়ে এসেছ ত!" বলিয়া সুশীলা তাহার ঘরে গিয়া ঢোকে। খোঁড়া রুগ্ণ ছেলেটাকে কোলে লইয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে, "আমরা খাই না খাই তাতে ত তোমার দরকার নেই!"

কোনদিন বা সুশীলা বলে, "তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে বাবা, একটু মরণের ভয় হয় না? বুড়ো হ'লে ত লোকের একটু ধর্মে-কর্মে মতি হয়।"

মেয়ের এ কথা কৃত্তিবাসের সহ্য হয় না; হঠাৎ বলিয়া ফেলে, "তোর তাতে কি। বুড়ো হয়েছি বুড়ো হয়েছি, আমার পরকালের কথা আমি ভাবব, তোর তার জন্যে এত মাথাব্যথা কেন?"

"আমার মাথাব্যথা কিছু নয় বাবা, তবে তোমার আর নাজির জ্যেঠার কথা শুনে লোকে যে ছি-ছি করে।"

"করুক! আমি কারো ধার ধারি না" বলিয়া কৃত্তিবাস লাঠিতে ভর দিয়া দুর্বল শিরদাঁড়াটাকে কোনরকমে সোজা রাখিবার চেষ্টা করিয়া চলিয়া যায়।

বয়স তিন জনেরই ষাটের কোটা পার হইয়াছে। যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতার তিন সাথী। কেমন করিয়া এই বন্ধুত্ব যে চল্লিশ বৎসর টিকিয়া আছে ভাবিলে বিস্ময় লাগে।

রামকমল নাজিরগিরি করিত। পয়সা কামাইয়াছিল নাকি অনেক এবং অপব্যয় করিয়াছিলও নাকি বিস্তর। সুতরাং কিছু

রাখিতে পারে নাই। সামান্য যাহা-কিছু আছে তাহাতে কোন রকমে একটি ছোট বাড়ি ভাড়া করিয়া কায়ক্লেশে চলে। কিন্তু বৈঠকখানা তাহার তবু খোলাই থাকে। সকাল বেলা গড়গড়াটি হাতে লইয়া সে সেখানে আসিয়া বসে। দেখিলে মনে হয় না যে একদিন সে যৌবনের কোন উচ্ছৃঙ্খলতাই বাকি রাখে নাই। প্রশান্ত সুন্দর চেহারা, মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে বটে কিন্তু দেহ তাহার যৌবনের মত সতেজ সুন্দর। সে দেহের সৌন্দর্যের জন্য সতর্কতারও তার অন্ত নাই।

খানিক বাদে সদানন্দ আসিয়া হাজির হয়। বয়স বোধ হয় ইহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে অল্পই হইবে। কিন্তু বার্ধক্যে সে-ই সবচেয়ে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। লাঠি ধরিয়া উঠিয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলে, "হাঁফানিটা বড় বেড়েছে ভাই। কাল সারারাত ঘুমোতে দেয়নি।"

"কে ঘুমোতে দেয়নি—হাঁফানি না গিন্নি?" বলিয়া রামকমল হো হো করিয়া হাসে।

সদানন্দ ভ্রূকুটি করিয়া বলে, "না ভাই, তার কি আর নাগাল পাবার জো আছে।" তারপর হাত দিয়া স্ত্রীর বিপুল পরিধি দেখাইয়া হাসিবার চেষ্টায় কাসিয়া একাকার করে।

কৃত্তিবাস সমস্ত রাস্তা লাঠি ধরিয়া আসিয়া দরজার কাছ হইতে লাঠিটি বগলে করিয়া সোজা হইয়া ঘরে ঢুকিবার চেষ্টা করে। ফরাসের উপর বসিয়া পড়িয়া বলে—"আর একটা

বিয়ে কর সদানন্দ, বুকের ও হাঁফানি-টাফানি সব সেরে যাবে।”

সদানন্দ বলিচিহ্নিত লোলচর্ম মুখের অপূর্ব ভঙ্গি করিয়া বলে, “তাতে কি আর অসাধ দাদা? একটা কেন, পাঁচটা দাও না!”

অত্যন্ত কুৎসিত একটা রসিকতা করিয়া রামকমল হাসিতে থাকে।

কৃত্তিবাস বলে, “কিছু থাকে ত বার কর না ভাই, কালকের খোঁয়াড়ি ভাঙা যাক্।”

সদানন্দ বাধা দিয়া বলে, “না না, থাক্ ভাই, সকাল বেলা আবার কেন? এ বয়সে অত সহ্য হবে না।”

সহ্য কৃত্তিবাসেরও হয় না, কিন্তু সেকথা স্বীকারের লজ্জা বড় বেশি, সে-ই সবচেয়ে জোরে প্রতিবাদ করিয়া বলে, “বয়স আর বয়স! তুমি এবার মরবে সদানন্দ, বয়স বয়স ক'রে যমকে যে রকম তলব দিচ্ছ!”

সদানন্দ লজ্জিত হইয়া পড়ে, বলে, “না না, তা বলিনি, তবে সকাল বেলাটা—!”

রামকমল তখন সব বাহির করিয়াছে। ভিতরের দিকের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া বলে, “বড়বৌ আবার দেখতে পেলে গোল বাধাবে!”

দু'এক পাত্র চলিবার পর মুখ সকলের খুলিয়া যায়। সদানন্দ হাঁফানির ভয় ভুলিয়া যৌবনের কাহিনী সদর্পে বলিতে সুরু করে।

রামকমল বড়বৌএর কথা ভুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে যে সব কথা বলিতে সুরু করে প্রিয়তমা পত্নীর পক্ষে সে সকল কথা একটু শ্রুতিকটুই বটে।

বেলা ক্রমশ বাড়িয়া যায়। ভিতর হইতে দরজায় ঠেলা দিয়া বড়বৌ ঝঙ্কার দিয়া বলে, "দেব সব ঝেঁটিয়ে বিদেয় ক'রে। মুখপোড়াদের মরণও হয় না। বন্ধু এসেছেন!"

রামকমল তখন বেপরোয়া। হাঁকিয়া বলে, "সদানন্দ কৃত্তিবাস আজ এখানেই খাবে, বুঝেছ বড়বৌ?"

"হ্যাঁ বুঝেছি, বুঝব না কেন? উনুনের পাঁশ ত আজ ফেলিনি তাই।" বলিয়া রাগে গরগর করিতে করিতে বড়বৌ চলিয়া যায়।

তাহারা হাসিতে থাকে। এ তাদের নিত্য-নিয়মিত ঘটনা। রামকমল হাসিয়া বলে, "মেয়েমানুষ জাতটাই অমনি—ফাঁকা আওয়াজ খালি।"

যৌবন যাহাদের গিয়াছে তাহাদের যৌবনের স্মৃতির কাহিনী তারপর আর থামিতে চাহে না। পুরানো কাহিনীগুলির তাহারা সানন্দে পুনরাবৃত্তি করে। দিনের পর দিন একই কথা অমনি তাহারা বলিয়া আসিয়াছে ও পরস্পর পরস্পরকে তারিফ করিয়াছে। স্মৃতিকে জাগ্রত রাখিয়াই তাহারা কোনরকমে যৌবনকে ধরিয়া রাখিতে চায়।

সদানন্দ মাঝে মাঝে একটু ব্যস্ত হইয়া ওঠে, বলে, "যাই ভাই,

ছেলেটা আবার বড় রাগ করে।" কিন্তু তাহার যাওয়া আর ঘটিয়া ওঠে না।

অনেক রাত্রে কৃত্তিবাস যখন বাড়ি ফেরে তখন পথ নির্জন হইয়া গিয়াছে। নিস্তব্ধ রাস্তায় চলিতে চলিতে কোমরের ব্যথাটা তাহার অসহ্য মনে হয়। মনে হয় পিঠটা নোয়াইয়া কুঁজো হইয়া চলিলে বোধ হয় অনেকটা আরাম পাওয়া যায়। কিন্তু একদিন নোয়াইলে আর সে পৃষ্ঠের সোজা হইবার আশা নাই জানিয়া বার্ধক্যকে অস্বীকার করিবার প্রাণপণ চেষ্টায় সে খাড়া হইয়াই চলে। মনে মনে তাহার রামকমলকে হিংসা হয়। অত্যাচার সে ত কাহারও চেয়ে কম করে নাই, কিন্তু তাহার দেহই বা অটুট রহিল কেন ?

সুশীলার কিন্তু এক-একদিন অসহ্য হইয়া ওঠে। শুধু তার বাবার উপর নয়, সমস্ত পৃথিবীর উপর তাহার রাগ হয়। খোঁড়া রুগ্ণ মেয়েটার পানে চাহিয়া বিধাতাকে পর্যন্ত তাহার অভিশাপ দিতে ইচ্ছা করে।

রূপসী সে কম ছিল না। কিন্তু কবে যে সে রূপ তাহার দেহে শুকাইয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে আজ তাহার সন্ধান পর্যন্ত মেলে না। রূপের জন্যে বড়লোকের ঘরে বিবাহ হইয়াছিল কিন্তু স্বামী জীবনে তাহাকে অবহেলা লাঞ্ছনা ও মৃত্যুর পর বৈধব্য ও

নিজের দূষিত রক্তের বিকলাঙ্গ উন্মাদ দুটি সন্তান শুধু দিয়া গিয়াছে।

ছোট মেয়েটি ভালো করিয়া হাঁটিতে পারে না, দুটি পায়ের হাড়ই তার বাঁকা। আর রোগ ত তাহার লাগিয়াই আছে। প্রতিবেশীর ছেলেমেয়েদের সহিত সে যখন বাঁকা পায়ে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে খেলিতে গিয়া হাস্যাস্পদ হয় তখন সুশীলার চক্ষে নিদারুণ দুঃখে জল আসে না, আগুন বাহির হয়। ছেলেটির দেহের কোনো দোষ নাই বটে কিন্তু সে একেবারে নির্বোধ, উন্মাদ বলিলেও হয়।

কয়েকদিন ধরিয়া মেয়েটির জর আর ছাড়িতে চাহিতেছে না। সর্বাঙ্গে ক্ষত লইয়া সে সারাদিন যন্ত্রণায় চীৎকার করে। অসহ্য হইলে জরের উপরই তাহাকে কয়েক ঘা চড় বসাইয়া দিয়া সুশীলা বলে, "মর্ না, মরলে ত বাঁচি!"

কিন্তু রাগ করিবার অভিমান করিবারও উপায় নাই। কাহার উপর করিবে। আবার নিজেকেই ভুলাইতে বসিতে হয়।

সেদিন সকালে কৃত্তিবাস বাহির হইবার উপক্রম করিবার আগেই সুশীলা বাধা দিয়া বলিল, "আজ কোথাও যেতে পাবে না বাবা। খুকির জন্যে ডাক্তার একটা আনতেই হবে।"

"ও জর আপনিই সেরে যাবে" বলিয়া বোঝাইবার চেষ্টা করিয়া কৃত্তিবাস বাহির হইয়া যাইতেছিল, হঠাৎ সুশীলা একেবারে উগ্রমূর্তিতে সামনে আসিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিল, "আজ তুমি কিছুতেই

বেরুতে পাবে না বাবা। খুকি মরতে বসেছে! আজ একটা ডাক্তার তোমায় আনতেই হবে!" তারপর নিজের বাক্স খুলিয়া শেষ অলঙ্কারটি বাহির করিয়া দিয়া বলিল, "তোমার টাকা না থাকে, এইটে বাঁধা দিয়েও নিয়ে এস, নইলে এইখানে আমি আজ আত্মহত্যা করব।"

কৃত্তিবাস একটু ভয় পাইয়া গিয়াছিল। বলিল, "তা অমন পাগলামি করছিস কেন! আমি কি ডাক্তার আনব না বলেছি! তবে মিছিমিছি—।"

চীৎকার করিয়া সুশীলা বলিল—"না, মিছিমিছি নয়! আমার জীবনটাকেই তোমরা মিছিমিছি ক'রে দিয়েছ—আজ আর শুনব না!"

"আহা চেঁচাস কেন? যাচ্ছি ত" বলিয়া কৃত্তিবাস গহনাটা তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

সুশীলা অনেকবার এমন রাগিয়াছে। কিন্তু এবার কৃত্তিবাস একটু ভয় পাইয়াছিল। গহনা বাঁধা দিয়া টাকা লইয়া সে ডাক্তারের জন্য বাহির হইল। রামকমলের সহিত দেখা হইবার ভয়ে সে একটু পাশ কাটাইয়াই যাইবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু রামকমল দেখিয়া ফেলিল, ডাকিয়া বলিল, "কিহে, ওদিকে আবার চলেছ কোথায় হে?"

কৃত্তিবাসকে থামিতেই হইল। বলিল, "চলেছি একটু ডাক্তারের বাড়ি ভাই, নাতনিটার বড় অসুখ!"

"আহা, যাবে'খন, একটু বোসোনা।"

কৃত্তিবাস বসিল এবং খানিকক্ষণ বসিবার পর তাহার মনে হইল মেয়েছেলের কথায় ভয় পাইয়া অত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন বোধ হয় নাই। সদানন্দ রামকমল তাহাকে সেই কথাই বুঝাইয়া দিল।

আরও কিছুক্ষণ আলাপের পর তাহার মনে হইল গহনা যখন বাঁধাই দেওয়া হইয়াছে তখন অতগুলি টাকা সুশীলাকে দেওয়া বোধ হয় উচিত নয়, সে বাজে খরচ করিবে।

এতগুলা টাকা! শুধু একটা রুগ্ণ বিকলাঙ্গ মেয়েকে দু-ফোঁটা ওষুধ খাওয়াইয়া একটা ডাক্তার লুটিয়া লইয়া যাইবে, এ যেন সে ভাবিতে পারিতেছিল না।

সদানন্দ কি-একটা পুরাতন কাহিনী সবিস্তারে বলিবার চেষ্টা করিতেছিল। সেদিকে তাহার কান ছিল না। ফিরিয়া ফিরিয়া তাহার মন যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল রঙীন দিনগুলির নাতিস্পষ্ট স্মৃতির পাশেই ঘুরিয়া মরিতেছিল।

হঠাৎ তাহার মাথায় একটি কল্পনা খেলিয়া গেল। রামকমলের হাত ধরিয়া বলিল, "আমাদের সেই নৌকা ক'রে নবদ্বীপ যাবার কথা মনে আছে কমল?—কি মজাই হয়েছিল দশদিন!"

"মনে আবার নেই—সেইবারই ত ফিরে এসে দেখি গিন্নি হাতের নোয়া খোলবার জোগাড় করছেন!"

সদানন্দ বলিল, "প্রায় কুড়ি বছর হ'ল না?"

"দূর ! তারও বেশি" বলিয়া কৃত্তিবাস বলিল, "আর একবার সে-রকম করলে হয় না ?"

"করলেই হয় !" বলিয়াও অত্যন্ত হতাশ ভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রামকমল বলিল, "তেমন কাঁচা পয়সা কি আর হাতে আছে ভাই !"

কৃত্তিবাসের রোখ চাপিয়া গিয়াছিল। পকেট হইতে সমস্ত টাকাগুলি বাহির করিয়া বলিল, "কুচ পরোয়া নেই, মরি ত ফুর্তি ক'রে মরব।"

রামকমল, সদানন্দ, এতটা আশা করিতে পারে নাই। বলিল, "সত্যি যাবে নাকি ?"

মেজে চাপড়াইয়া কৃত্তিবাস বলিল, "তা না ত কি ?" এবং হঠাৎ এতদিন বাদে সকলের কাছে স্বীকার করিয়া ফেলিল, "দিন ত ফুরিয়ে এসেছে দাদা, এমন স্থবিধে আর হবে ?"

তিন বৃদ্ধ যৌবনের কথা স্মরণ করিয়া মাতিয়া উঠিল।

নৌকা জোগাড় হইল। সাজ সরঞ্জাম সবই সঙ্গে লওয়া হইল। শুধু নৌকায় উঠিয়া বসিয়া একবার সদানন্দ বলিল, "তোমার নাতনির অসুখটা এমন কিছু নয়, কি বল ?"

কৃত্তিবাস হাত দিয়া সে কথাটাকে যেন একেবারে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "তাহ'লে বলি শোন ভাই, ও ধোঁড়া মেয়ে বেঁচে থাকলে

অশেষ দুর্দশা ! আমি ত বলি তার চেয়ে এই বয়সে ম'রে যায় সেই ভালো,—দুনিয়ার কষ্টভোগ আর করতে হবে না !"

সদানন্দ কিছু বলিতে পারিল না—দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া সে তখন হাঁপানি কাসির বেগ সামলাইতেছে।

কোমরটা অত্যন্ত ঝন্ ঝন্ করিতেছিল বলিয়া কৃত্তিবাস একটু সরিয়া ছইএ ভালো করিয়া ঠেসান দিয়া বসিল।

এই দ্বন্দ্ব—

বুদ্ধি-শুদ্ধি তাহার কোনো কালেই ছিল না।

ছেলেবেলা নাকি ইট কেন জলে ভাসে না বলিয়াই একদিন তুমুল আন্দোলন করিয়াছিল। দুঃখের বিষয় এতবড় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা দেখিয়াও কেহ তাহাকে ভবিষ্যৎ নিউটন বলিয়া মনে করিতে পারে নাই।

তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধিহীনতা সম্বন্ধে এমন আরো অনেক কাহিনীই প্রচলিত আছে। পোস্টকার্ড কিনিতে গিয়া কবে সে ডাকবাক্সে পয়সা ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছিল একথা লইয়া তাহার ভাই-বোনেরা সেদিন পর্যন্ত তাহাকে ক্ষেপাইয়াছে।

এই পতিতপাবন বড় হইল। সমবয়সীদের উপহাস, আত্মীয়-গণের করুণামিশ্রিত অবজ্ঞা, সমস্ত সহ্য করিয়াও পতিতপাবন সুস্থ সবল দীর্ঘ দেহ লইয়া বাড়িয়া উঠিল।

বুদ্ধিহীন! তথাপি পতিতপাবন বোঝে, কোথায় সাধারণ মানুষ হইতে সে একটু তফাৎ। এই পৃথিবীকে তাহারা যেমন

করিয়া দেখে, যেমন করিয়া উপভোগ করে, ঠিক তেমনটি সে পারে না।

তাহার মনের চারিধারে কালো অস্পষ্টতার পর্দা কে যেন টাঙাইয়া রাখিয়াছে; তাহার ভিতর দিয়া সবই তাহার কাছে ঘোলাটে হইয়া দেখা দেয়। এইটুকু পতিতপাবন বোঝে এবং তাই চুপ করিয়া থাকে। পতিতপাবনের নির্বুদ্ধিতা অশোভন আচরণে নিজেকে কুৎসিত করিয়া তোলে না।

পতিতপাবনের বয়স হইয়াছে,—বিবাহের বয়স!

তাহার মাতা চিন্তিতা হইয়া উঠিয়াছেন। পিতা সেকথা পাড়িলে কিন্তু বিরক্ত হইয়া বলেন, "তোমার ও হাবা ছেলের সঙ্গে কে মেয়ের বিয়ে দেবে? কার অমন দায় পড়েছে!"

কথাগুলি মায়ের বুকের ভিতর পর্যন্ত গিয়া বেঁধে। মুখে তিনি হাসিয়া বলেন, "তোমার অমনি কথা! হাবা কিসের! সত্যি হাবা ত আর নয়, একটু না হয় বোকা!"

পিতা কিছু না বলিয়া চলিয়া যান। গোপনে গোপনে ঘটক নিযুক্তও করেন।

সত্যই পতিতপাবন হাবা নয়। এ সব কথা তাহারও কানে যায়। সাধারণ হইতে পৃথক বলিয়া সাধারণের মত হইবার কামনা

তাহার সর্বাপেক্ষা বেশি। তাহার মন কোনো অস্পষ্ট স্বপ্নে বিভোর হইয়া যায়।

তাহার পর পতিতপাবনের বিবাহ হইল।

এবং পতিতপাবনের বৌ দেখিয়া পাড়ার লোক আশ্চর্য হইয়া গেল। পাশের বাড়ির বামুন-দিদি ত নাতিমৃদু কণ্ঠে শুনাইয়াই গেল 'বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা!'

মুক্তামালা!

মুক্তামালা বলিলেই বুঝি সেই পরম বিস্ময়কর রূপের কিছু আভাস দেওয়া যায়। তেমনি স্নিগ্ধ লাবণ্য এই মেয়েটির সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া আছে। সে মুক্তামালা কোথায় সর্বাপেক্ষা ভালো মানাইত গবেষণা করিয়া বলা কঠিন হইলেও, পতিতপাবনের পাশে যে মানায় নাই একথা সহজেই বলা যায়।

নাম তাহার পরী। এবং যে নাম রাখিয়াছিল ভবিষ্যৎ দৃষ্টি তাহার বোধহয় ছিল। এ হেন পরীর পতিতপাবনের সহিত কেন বিবাহ হইল তাহার কারণ নির্ণয় করা দুরূহ নয়। পরী পৃথিবীতে রূপ লইয়া আসিয়াছিল কিন্তু ভাগ্য লইয়া আসিতে পারে নাই। চারিটি কন্যা ও একটি ছেলের পর দরিদ্র প্রেসের কম্পোজিটারের ঘরে পরী যেদিন আসিয়াছিল সেদিন তাহার রূপের সম্ভাবনা

দেখিয়াও কেহ প্রসন্ন হয় নাই। কাহাকেও প্রসন্ন করিতে পারে নাই সে কথা পরী বুঝি তখন হইতেই জানিত। তাহার মুখের সুদূর গাম্ভীর্য ছেলেবেলা হইতেই মানুষকে বিস্মিত করিয়াছে।

০

প্রথম ফুলশয্যার রাত্রি!

আড়ি যাহারা পাতিতে আসিয়াছিল, একটি কথাও শুনিতে না পাইয়া অবশেষে ক্লান্ত হইয়া তাহারা চলিয়া গেল।

পরী বিছানার একধারে পাশ ফিরিয়া শুইয়া ছিল। ঘরের ভিতর অন্ধকার। তাহার মুখ দেখিবার উপায় ছিল না। থাকিলে বোধহয় দেখা যাইত সে মুখে আনন্দ আশা বা ভয় কিছুরই আভাস নাই। এই সমস্তগুলিই কিন্তু একত্র হইয়াছিল পতিতপাবনের মুখে।

অনেকক্ষণ ভয়ে দ্বিধায় সঙ্কোচে কাটাইয়া পতিতপাবন হঠাৎ সরিয়া গিয়া পরীর ডানহাতটা ধরিয়া ফেলিল, কিন্তু প্রথম প্রিয়া-সম্ভাষণের কোনো কথা সে খুঁজিয়া পাইল না। তাহার বুকের ভিতর আনন্দ-আবেগের যে আলোড়ন উঠিয়াছিল মুখের ভাষায় তাহাকে প্রকাশ সে করিতে পারিল না।

অবশেষে নিরুপায় হইয়াই বলিল, "অন্ধকারে তোমার ভয় করছে, আলো জ্বালব?"

পরী কথা কহিল না, নড়িল না ; শুধু বাঁহাত দিয়া পতিতের হাতটা সরাইয়া দিল।

এবার পতিতের মনে হইল পরী বুঝি লজ্জা করিতেছে এবং সে লজ্জা ভাঙিবার জন্য একটু জোর করা প্রয়োজন।

সে পরীর ডান হাতটা আবার ধরিয়া ফেলিয়া একটু জোরে টান দিয়া বলিল, "কেউ ত আর দেখছে না, এসই না কাছে।"

টানটা একটু বেশি জোরেই হইয়া গিয়াছিল—পরী হাতে একটু ব্যথাও পাইয়াছিল। বেদনাসূচক শব্দ করিয়া সে সজোরে হাতটা ছাড়াইয়া লইল।

ভীত চকিত হইয়া উঠিয়া বসিয়া পতিত কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার লেগেছে ?"

পরী এবার কথা কহিল; লজ্জাজড়িত মৃদু অস্ফুট কণ্ঠে নয়, স্পষ্ট সহজ স্বরে বলিল, "না, তুমি ঘুমোও।" তাহার পর পতিত কিছু ভাবিতে আরম্ভ করিবার পূর্বেই আবার বলিল, "আমায় বিরক্ত করলে আমি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে যাব।"

পতিত বিরক্ত করিতে সাহস করিল না। বিছানার একপাশে শুইয়া পড়িয়া প্রিয়ার সহিত আলাপ করার দুরূহ কাজটিতে কোথায় ত্রুটি হইয়া গেল তাহাই ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

যখন ঘুম ভাঙিল তখন বেশ আলো হইয়া গিয়াছে। আগের দিনের বিবাহ-বাড়ির কর্মক্লান্ত লোকজন কেহ উঠে নাই, কিন্তু

বাহিরে উচ্ছিষ্ট পাতা গেলাস লইয়া কাক কুকুরের কোলাহল বাধিয়া গিয়াছে।

হঠাৎ চমকিয়া পতিতপাবন দেখিল পরী ঘরের বিছানায় নাই।

ঘরের দরজা খোলা। তাহা ঠেলিয়া বাহিরে যাইতেই দেখা গেল ঘরের বাহিরে দালানের একপাশে শুধু মাটির উপর শুইয়াই পরী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নিদ্রার ভিতর তাহার মুখের সে সুদূর গাম্ভীর্য সরিয়া গিয়াছে; সেখানে একটি কোমল অসহায় কাতরতা। পতিতের ইচ্ছা করিল সেই পরম সুন্দর দেহখানি সযত্নে বুকের কাছে তুলিয়া লইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া আসে।

ফুলশয্যার রাত্রি তাহাদের এমনি করিয়াই কাটিল।

বৌ-এর সবই ভালো।

বৌ শুধু মুখ বুজিয়া থাকে। আপত্তি তাহার কিছুতে নাই, অবাধ্যতাও নয়। যাহা আদেশ হয় নীরবে পালন করিবার চেষ্টা করিয়া যায়। কিন্তু ঘোমটার ভিতর তাহার মুখ কেহ বড় দেখিতে পায় না, সে মুখের শব্দ শুনিতে ত নয়ই।

শাশুড়ি বলেন, "ও আবার কি কথা বৌমা, আমার সামনে তোমার ননদের সামনে আবার অতখানি ঘোমটা কিসের?"

একটি ননদের মুখের ধার একটু বেশি। এতদিন এ বাড়িতে স্বন্দরী বলিয়া প্রশংসাটা তাহার একচেটিয়া ছিল, সম্প্রতি নতুন-বৌ আসাতে সেটা হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। আক্রোশও হয়ত তার তাই—

সে মুখ ঝামটা দিয়া বলে, "এ বাড়ির আলো-বাতাস লাগলে রঙ তোমার ময়লা হয়ে যাবে নাগো স্বন্দরী। একটু মুখ খোলো। আর তুমি বোবা নাকি, একটা কথা ত এ মুখের শুনতে পেলাম না এ পর্যন্ত!"

মুখে যাহাই বলুন, অন্তরে এই স্বন্দরী মেয়েটিকে শাশুড়ি না ভালোবাসিয়া থাকিতে পারেন নাই। কটুভাষিণী কন্যার বাক্য-বিষ কাটাইয়া দিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিয়া ওঠেন, "লজ্জা-শরম ভালো বই কি মা, ভালো! কিন্তু তুমি আমার ঘরের মেয়ের মত হাসবে খেলবে, তাই দেখে না আমার আহ্লাদ! তুমি মুখটি বুজে চুপ ক'রে থাকলে আমার দুঃখ হয় না!"

তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় বলেন, "তোমার কি বাপের বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে বৌমা?"

মাথা নাড়িয়া পরী জানায়, 'না।'

শাশুড়ি খুশি হইয়া বলেন, "মন কেমন করবে কেন মা! এ তোমার বাড়ি তোমার ঘর! এ সব পেয়ে আর কি মন কেমন করে! আমাদের বিয়ে হয়েছিল মা ওই অতটুকু বেলায়!" বলিয়া তাঁহার কনিষ্ঠা সাত বৎসরের কন্যাকে দেখাইয়া দিয়া

আবার স্থরু করেন, "তখন কি কিছু বুঝতুম। বিয়ে ত বিয়ে। বিয়ের রাত্রে ভারি মজা। লুকিয়ে লুকিয়ে ঠাকুমা সন্দেশ খাইয়ে দিয়ে বলেছিল, 'এ সব যে রান্নাবান্না হচ্ছে কাল খাবি।' আলো বাজনা লোকজনের ভেতর তাই নিয়েই খুশি আছি। ওমা, তার পরদিন যেই বলে গাড়িতে উঠে বরের সঙ্গে যেতে হবে—আর কোথায় আছে। এক্কেবারে চেলির কাপড়-চোপড় গয়নাপত্র সমেত ছুটে গিয়ে ঠাকুমার পূজোর ঘরে। তারাও ছাড়বে না আমিও ঠাকুমার কাপড় ছাড়ব না। সেই সঙ্গে চীৎকার ক'রে কান্না 'ওগো ঠাকুমা, আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যাব না!' ঠাকুমা ত খানিক টানাহেঁচড়ার পর কিছুতে যখন আমায় ছাড়াতে পারলেন না, তখন একবার ভয়ে ভয়ে বললেন, 'হ্যাগা এখন না হয় না নিয়ে গেলে হয় না? পরে না হয় ভুলিয়ে ভালিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে?' বাবা ধমক দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার যেমন কথা,—বিয়ের ক'নে, না নিয়ে গেলে হয় না!' সেই শেষে জোর ক'রে নিয়ে গেল। সারা পথ ত পালকির ভেতর রাগে দুঃখে ফোঁপাতে ফোঁপাতে গেলুম।

"একবারটি তোমার শ্বশুর" এই পর্যন্ত বলিয়াই হাসিয়া কুটিপাটি হইয়া অনেক কষ্টে হাসির ভিতর তিনি শেষটুকু বলেন। "তোমার শ্বশুর একবারটি যেই ঠাট্টা ক'রে ঘোমটা সরিয়ে দেওয়া অমনি বুড়ো আঙুলটা ধ'রে সজোরে কামড়ে'—সে একেবারে রক্তারক্তি

কাণ্ড। তোমার শ্বশুরই বা আর তখন কত বড়; কেঁদে ককিয়ে অস্থির। পাল্‌কি থামিয়ে, সবাই এল ছুটে—"

বাধা দিয়া শাশুড়ির কটুভাষিণী কন্যা বলে, "এ গল্প মা তুমি কম পক্ষে হাজারবার আমাদের কাছে করেছ! শুনে কান পচে গেছে।"

শাশুড়ি অপ্রস্তুত হইয়া বলেন, "আহা তোরা না হয় শুনেছিস! বৌমা ত আর শোনেনি।"

কিন্তু এত আদর, স্নেহ, মমতা কিছুতেই সে তুষারশিলা গলে না।

পরীর মুখের ঘোমটাও ওঠে না, কথাও ফোটে না।

পতিতপাবন বুদ্ধিমান বন্ধুদের কাছে শিখিয়া পড়িয়া ভূমিকায় দুরস্ত হইয়া রাত্রে শয়নকক্ষে প্রবেশ করে।

পরী বিছানায় জাগিয়াই চুপ করিয়া শুইয়া থাকে, ঘাড় পর্যন্ত ফিরায় না।

ঘরের কোণ হইতে প্রদীপটি তুলিয়া লইয়া পতিতপাবন তাহার মুখের কাছে ধরিয়া বলে, "বাঃ, আজ তোমাকে চমৎকার দেখাচ্ছে!"

চোখে আলোক লাগিতে পরী নীরবে চোখ খুলিয়া চায়।

সামান্য একটু বিস্ময় ছাড়া সে অপরূপ সুন্দর চোখে আর কিছুই নাই।

বন্ধুরা বলিয়া দিয়াছিল এই উক্তির পর 'যাঃ' বা 'ধেৎ' বলিবামাত্র স্ত্রীকে 'নাঃ সত্যি বলছি' বলিয়া জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিতে।

কিন্তু পরী 'যাঃ' বা 'ধেৎ' কিছুই বলে না। বিস্মিত ভাবে পতিতপাবনের দিকে চাহিয়া বলে, "আলোটা নামিয়ে রাখ।"

সে দৃষ্টির সামনে পতিত কেমন যেন ভড়কাইয়া যায়। কম্পিত হাতের প্রদীপ হইতে খানিকটা তেল বিছানার উপরই পড়িয়া যায়।

"চাদরটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে"—নির্লিপ্ত ভাবে পরী জানাইয়া দেয়।

"না, এই যে রাখি।" আরো খানিকটা তেল চাদরে ফেলিয়া পতিত প্রদীপ নামাইয়া রাখে।

তাহার পর কি করিতে হইবে কিছুই ভাবিয়া পায় না। রাগ হয় শুধু তাহার নিজের উপর। তাহারই নিজের দোষে এই মেয়েটির মনের রুদ্ধ দ্বার সে খুলিতে পারিতেছে না এমনি একটা অস্পষ্ট ধারণা তাহাকে পীড়া দিতে থাকে। এই মেয়েটির প্রীতির জন্য অন্তরের প্রেরণায় যাহা কিছু সে করিতে যায় তাহাই হয়ত বাহিরে এমন অশোভন কদাকার দেখায় যে নারীর মন বিমুখ না হইয়া পারে না।

অনেকক্ষণ বাদে প্রদীপ নিভাইয়া বিছানায় আসিয়া পতিত

শুইয়া পড়ে। অন্ধকারে সন্তর্পণে বিছানায় হাতড়াইতে হাতড়াইতে পরীর অঞ্চলের একটি প্রান্ত তাহার হাতে ঠেকে। লুব্ধ হাত আরো অগ্রসর হইয়া একটু স্পর্শ করিতে চায়। কিন্তু পতিত অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়া নিরস্ত হয়।

শুধু সেই অঞ্চলপ্রান্তটি মুঠির মধ্যে চাপিয়া সে ঘুমাইয়া পড়ে।

বন্ধুরা বলে, "তুই একেবারে মেনি-মুখো! নইলে বৌ আবার কার তুমাসে কথা কয় না, গা ছুঁতে দেয় না!"

আরো বলে,—"মেয়েরা অমন মেনিমুখো পুরুষ পছন্দ করে না। তাদের লজ্জা তুই জোর ক'রে ভাঙবি, না তুই মরছিস লজ্জায়! জোর-জবরদস্তি তারা চায় তা জানিস্?"

নারীর প্রণয়লাভবিস্থায় এসব কৌশলের স্থান হয়ত আছে। কিন্তু পতিতের তাহা কাজে লাগে না।

পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সে আড়ালে পাইয়া একবার পরীর আঁচলটা টানিয়া কাঁধ হইতে নামাইয়া দিয়া যায়। দূরে গিয়া অনেক আশায় ফিরিয়া দেখে—পরী হয়ত হাসিয়া ফেলিয়াছে, রাগের ভাণও করিতে পারে।

কিন্তু পরীকে দেখা যায় না। আঁচলটা আবার কাঁধে তুলিয়া দিয়া সে নিজের কাজে তখন চলিয়া গিয়াছে।

আর এক সময় ঘরের ভিতর সে পিছন হইতে গিয়া পরীর চোখ টিপিয়া ধরে।

এবার পরী প্রথম চমকাইয়া ওঠে, তাহার পর গম্ভীর স্বরে বলে, "চোখ ছেড়ে দাও, দেখতে পাচ্ছি না।"

এতদিনে একটা শেখা পাল্টা জবাব প্রয়োগ করিবার সুযোগ পতিত পায়,—

"তুমি এ কালোমুখ না-ই দেখলে, আমি ত সুন্দর মুখটা দেখতে পাচ্ছি।" বলিয়া কাঁধ দুইটি ধরিয়া পরীকে তাহার দিকে ফিরাইয়া দেয়। কিন্তু মনে মনে সে বুঝিতে পারে যেমন করিয়া চোখ টিপিলে যেমন করিয়া কথা বলিলে ভালো দেখাইত ও মানাইত তাহা সে পারে নাই। কেমন যেন বিসদৃশ হইয়া গিয়াছে। তাহার সব কাজ এমনই হইয়া যায়। সহজ ভাবে হাসিতে গিয়া সে বুঝিতে পারে মুখ তাহার সঙ্কোচে অস্বস্তিতে কদাকার হইয়া উঠিতেছে। এবার তবু সে ছাড়ে না।

পরী আর একবার গম্ভীর স্বরে বলে, "ছেড়ে দাও।"

হঠাৎ চরম হতাশায় পতিত মরীয়া হইয়া উঠে, সবলে পরীকে বুকের ভিতর আকর্ষণ করিয়া বলে, "না, ছাড়ব না, আমায় কি একটু আদর করতেও নেই!"

পরী ছাড়াইবার জন্য জোর করে, কিন্তু পারে না। পতিত জোর করিয়া তাহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া উন্মত্ত আবেগে তাহার মুখ চুম্বন করে।

পরী যেন ক্ষেপিয়া যায়।

অকস্মাৎ আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া গালে চড় মারিয়া সে পতিতকে অস্থির করিয়া দেয় এবং বিমূঢ় পতিতের বাহুবন্ধন শিথিল হইবামাত্র প্রচণ্ড ঠেলায় তাহাকে একেবারে দেয়ালের কোণে ফেলিয়া দেয়।

কাঞ্চন সেই পথ দিয়াই বুঝি যাইতেছিল, ঘরের দরজায় থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলে, "ওকি হচ্ছে বৌদি!" তারপর "ওমা, দাদা, তোমার মাথা দিয়ে যে রক্ত পড়ছে—ওমা কি খুনে বৌ গো!" বলিয়া চীৎকার করিয়া শুধু মাকে নয় পাড়াসুদ্ধ লোককেই বোধ হয় ডাকিতে যায়।

প্রথমটা পতিত বুঝিতে পারে না কোথা হইতে কি এ হইয়া গেল। বুদ্ধি তাহার এবার কিন্তু অত্যন্ত তাড়াতাড়িই খুলিয়া যায়। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া সে কাঞ্চনের পিছু পিছু গিয়া ধরিয়া ফেলিয়া বলে, "চেঁচাচ্ছিস্ কেন, মা উঠে পড়বে যে!"

"মাকে ওঠাবার জন্যেই ত চেঁচাচ্ছি!"

দুপুরবেলা বাড়ির গৃহিণী একটু নিদ্রা দিতেছিলেন। উঠিয়া পড়িয়া বলেন, "কি হয়েছে তোদের ; অমন ডাকাতপড়া চীৎকার করছিস কেন?"

চীৎকারের কারণ জানাইতে কাঞ্চনের দেরি হয় না, "বৌদি যে দাদাকে খুন ক'রে ফেললে মা, দেখ মাথাথেকে রক্ত!"

শিহরিয়া শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িয়া মা বলেন, "ওমা সত্যি রক্ত যে, কি হল বাবা!"

পতিত তাড়াতাড়ি বলে, "পাগল নাকি মা, ঘরে ঢুকতে চৌকাটে হোঁচট খেয়ে প'ড়ে গেলুম। বড্ড রক্ত বেরুচ্ছে নাকি? শীগগির একটা ন্যাকড়া দিয়ে বেঁধে দাও ত।"

চোখ কপালে তুলিয়া কাঞ্চন বলে, "দাদা, তুমি এমনি ক'রে বৌএর দোষ ঢাকছ, কিন্তু তোমার মুখে ও নখের আঁচড়ের দাগগুলো ঢাকবে কি ক'রে শুনি?"

আজ সে অসাধ্য সাধন করিয়াছে, কিন্তু বুদ্ধি আর তাহার আসে না! তাড়াতাড়ি "কোথায় নখের দাগ!" বলিয়া সে সেখান হইতে সরিয়া পড়ে।

ঘরে আর-একটি পাষাণের মত নিশ্চল মেয়ের মুখ ঘোমটার ভিতর হইতে দেখা যায় না! দেখিতে পাইলে জানা যাইত বহুদিন বাদে পাষাণশিলা গলিয়াছে;—গলিয়াছে অকারণ অবারণ অশ্রুজলে।

শাশুড়ি, কি ভাবিয়া বলা যায় না, বলেন, "অনেক দিন বাপের বাড়ি যাওনি মা, হয়ত মন কেমন করছে, এবার কদিন ঘুরে এসো।"

পরী বাপের বাড়ি যায়।

বাপের বাড়ি বেশিদূর নয়।

একান ওকান হইয়া কথাটা পরীর মায়ের কানেও পৌছায়।

মেয়েকে ডাকিয়ে অগ্নিমূর্তি হইয়া তিনি বলেন, "হতভাগী, কি ক'রে এসেছ সেখানে! আমাদের মুখ পুড়িয়ে দিয়ে এসেছ ত?"

পরী মৌন হইয়াই থাকে।

দুঃখের সংসারের যত ব্যথা যত দুঃখ যত রাগ সঞ্চিত হইয়া ছিল, মা এই মেয়েকে ভৎর্সনার ছলে সমস্ত বাহির করিয়া দিয়া অবশেষে বলেন, "মর না, গলায় দড়ি দিয়ে মরলেও যে আমাদের জ্বালা জুড়োয়।"

সুগৌর সুঠাম একটি বছর-পঁচিশের ছেলে ঘরে ঢুকিবার দরজায় একদিকে হেলান দিয়া আর এক দিকে পা তুলিয়া দিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া নির্লিপ্তভাবে বক্তৃতার সুরে বলে, "তোমাদের বাড়ি তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখেছি মাসিমা, গলায় দড়ি দেবার জায়গা এখানে একটিও নেই। কড়িকাঠগুলো অত্যন্ত হাল্কা, তাতে ফুটো ক'রে দড়ি টাঙিয়ে ঝুলে পড়লে শুধু আত্মহত্যা নয় নরহত্যার পাতকও হবে, কারণ কড়িকাঠের সঙ্গে ছাদ সুদ্ধ প'ড়ে বাড়ির সকলের মরার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং আত্মহত্যা করতে হ'লে আমার মতে এবাড়িতে অন্য কোন উপায়েই ভালো। যথা—"

তাহার বক্তৃতায় বাধা দিয়া পরীর মা লজ্জিত সঙ্কুচিত হইয়া বলেন, "তুই কখন্ এলি শরৎ, দেখতে পাইনি ত!"

"না পাবারই কথা, তুমি তখন সদ্য-শ্বশুরালয়ফেরত পরীকে অভ্যর্থনা-সমিতির অভিভাষণ শোনাচ্ছিলে।"

"না বাবা, মেয়েছেলেকে মাঝে মাঝে একটু আধটু ব'কে শিক্ষা দিতে হয় বই কি। এখনই ত শেখবার সময়।"

"কিন্তু আত্মহত্যা শেখাবার এটা প্রশস্ত সময় ব'লে কোথাও পড়িনি।"

পরীর মা হাসিয়া বলিলেন, "বাবা, তোর সঙ্গে কথায় কে পারবে!"

পরী ইতিমধ্যে অন্য ঘরে চলিয়া গিয়াছিল।

"তা সত্যিকথা মাসিমা।" হঠাৎ বসিয়া পড়িয়া শরৎ বলিল, "পরী কোথায় গেল? শ্বশুরবাড়ি কেমন লাগল বলবে না?"

তাহার পর মাসিমার উত্তর দিবার পূর্বেই ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

টিনের ঘর হইলেও আয়তনে বড়। মেঝের একপাশে বসিয়া পরীর দিদি কাঁথা বুনিতেছিলেন, তাহারই একপাশে পরী নীরবে বসিয়া ছিল।

দিদি দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "এসো শরৎ!"

পরী হঠাৎ উঠিয়া যাইতেছিল, শরৎ হাঁকিয়া বলিল, "ধ'রে ফেলুন দিদি, শ্বশুরবাড়ির গল্প বলার ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।"

দিদি হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "তোমারও আচ্ছা আব্দার ত দেখি! বড় ভাইএর কাছে কেউ শ্বশুরবাড়ির গল্প বলে নাকি!"

"বেশ ত, সব না বলুক, শ্বশুরের কতবড় ভুঁড়ি, শাশুড়ি নথের

ফাঁক দিয়ে খায় কিনা, বরের পেটে কিল মারলে ক বেরোয় কিনা
—এসব ত বলতে পারে!"

"দূর মুখ্খু কোথাকার! ওর বরকে নিয়ে ঠাট্টা করতে পারো। কিন্তু ওর শ্বশুর-শ্বাশুড়ি হ'ল তোমার গুরুজন, তাদের নিয়ে কি তুমি ঠাট্টা করতে পারো?"

পরী কিন্তু তখন উঠিয়া গিয়াছে।

চমৎকার ছেলে শরৎ!

বিধাতা গনিয়া গনিয়া বুঝি সবক'টি আশীর্বাদই করিয়াছিলেন। স্বাস্থ্য শক্তি, রূপ, অর্থ, বুদ্ধি—কী তাহার নাই।

একেবারে পর হইয়াও মানুষের সহিত মিশিয়া যাইবার, আত্মীয় হইবার, অপরূপ কৌশলটি সকলের আয়ত্ত নয়, কিন্তু পর হইয়াও এই বাড়ির সকলের হৃদয়ে সে যে-পথে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাকে সকল সময়ে ঠিক সরল বুঝি বলা চলে না।

সবই তাহার হয়ত ছিল, কিন্তু জীবনের আনন্দ ও সৌভাগ্যের মূল্য দিতে শুধু সে শেখে নাই।

গোপনে দেখা করিবার সুবিধা শেষ পর্যন্ত শরৎ করিয়া লইলই।

রান্নাঘরে বসিয়া জটলা হইতেছিল। এক প্রান্তে শরতের নিকট হইতে মুখ আড়াল করিয়া পরী নীরবে বসিয়া ছিল।

মায়ের রাগ বুঝি তখনও একেবারে যায় নাই, হঠাৎ ভৎর্সনা

করিয়া বলিলেন, “শুধু ব'সে ব'সে হাঁ ক'রে গল্প শুনলেই হবে? স্থপুরিগুলো এনে কুচিয়ে ফেললে হ'ত না?”

পরী কোন কথা না বলিয়াই উঠিয়া চলিয়া গেল—

বাতিটা তুলিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া-পড়িয়া শরৎ বলিল, “রাগের মাথায় অন্ধকারে স্থপুরি আনতে আবার আলু এনে ফেলবে, যাই বাতিটা ধরি।”

তাহার অপরূপ ভঙ্গী দেখিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলেন। দিদি বলিলেন, “শরৎ বাপু সেই ছেলেবেলা থেকে পরীকে বড্ড ক্ষেপায়।”

ঘরের ভিতর গিয়া শরতের কিন্তু ভঙ্গী ও স্বর হঠাৎ বদলাইয়া গেল।

এক কোণে পাইয়া পরীর হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া গাঢ়স্বরে বলিল, “সব কি শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ভুলে গেলে পরী?”

“তুমি কেন আমার পিছু পিছু এলে, ওরা কি ভাববে বলো ত!” পরী হাতটা ধীরে ধীরে ছাড়াইয়া লইল।

“ওরা কিছু ভাববে না—তুমি আমার কথার জবাব দাও।”

পরী ঔদাসীন্যের স্বরে বলিল, “ভুলব কেন! এতদিনের জানা-শোনা—ভুলব কেন! মানুষ কি এমনি ভুলতে পারে নাকি?”

“কথা কাটাবার চেষ্টা কোরো না পরী, তুমি জানো আমি কী জিজ্ঞাসা করছি।”

"আমি জানি না। কিন্তু এখন সরো, মা ভাববে সুপুরি নিতে এত দেরি হচ্ছে কেন।"

হঠাৎ স্বর বদলাইয়া উচ্চ কণ্ঠে শরৎ বলিল, "দেখলে মাসিমা, তোমার গুণধর মেয়ে সব সুপরিগুলি ফেলে দিলেন; সব গেছে মেঝেতে ছড়িয়ে। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কর্মিষ্ঠি হয়েছে কিনা!"

মা সেখান হইতে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। পরী বিরক্ত হইয়া বলিল, "সুপুরি ত পড়েনি!"

গম্ভীরভাবে শরৎ বলিল, "না পড়ুক, খানিকক্ষণ আমরা কুড়োবার সময় ত পাব।" তাহার পর হঠাৎ পরীর কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া বলিল, "অনেক অভিমান হয়েছে পাগলী! আর থাক্!"

পরী সরিয়া গেল না, ক্ষিপ্ত হইয়া আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া একাকার করিল না। হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, "তুমি আমার স্বামীর চেয়ে কত নীচ কাপুরুষ জানো? তবু প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও তাকে আমি ভালোবাসতে পারছি না।"

বিজয়ের হাসি হাসিয়া পরীকে বুকের ভিতর টানিয়া শরৎ বলিল, "তাহোক, মেয়েদের স্বভাবই ওই।"

অসীম ঘৃণা ও অদম্য প্রেম মনের মধ্যে এমন করিয়া জট পাকাইয়া কেমন করিয়া থাকিতে পারে পরী বোধ হয় তাহাই ভাবিতেছিল।

—শেষ—

প্রবন্ধ

ডক্টর্ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের

## ভারতীয়-দর্শনের ভূমিকা ৩৲

## কাব্য বিচার ৪৷৷০

## রবিদীপিতা ৪৷৷০

ডক্টর্ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

## জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য ২৷৷০

## ভারত সংস্কৃতি ২৷০

## ইউরোপ, ১৯৩৮ (১ম ও ২য় খণ্ড) ৮৷৷০

## পশ্চিমের যাত্রী

*

অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরীর

## কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ৩৷৷০

## কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ৩৲

*

অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্রের

## সাহিত্য-পরিক্রমা ২৷৷০

*

অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

## ভারত ও মহাযুদ্ধ ২৲

*

সজনীকান্ত দাসের

## বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস ৫৲